আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার নবম গ্রন্থ।

বড়বাড়ী

শ্রীজলধর সেন

M. P. L.

আশ্বিন, ১৩২৩।

Published by
GURUDAS CHATTERJEA.
MESSRS GURUDAS CHATTERJEA & SONS
201, Cornwallis street, Calcutta.

Printed by
RADHASYAM DAS
AT THE VICTORIA PRESS.
2, Goabagan Street, Calcutta

নিবেদন।

আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক "আমার 'অভাগী'র দ্বিতীয় সংস্করণ ছয়মাসের মধ্যে প্রয়োজন হওয়ায় আমার ধৃষ্টতা সীমা-অতিক্রম করি[illegible] যাইতে না যাইতেই আমি উক্ত গ্রন্থমালার [illegible] বইখানি যদি কাহারও ভাল না লাগে, দুঃখিত হইব না,—ধৃষ্টতার দণ্ড হওয়া ত চাই!

কি কথা বলিবার জন্য এই বইখানি এত তাড়াতাড়ি লিখিলাম, তাহা আমিই জানি না, অপরকে কি বলিব।

কলিকাতা।
আশ্বিন, ১৩২৩।

শ্রীজলধর সেন।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্র

প্রহরাজ বাহাদুরের

করকমলে

দীন

লেখক কর্ত্তৃক

এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

ভক্তিভরে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

"এমন ঘরের হ'য়ে পরের মত

ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে?"

—সার রবীন্দ্রনাথ

বড় বাড়ী ।

[১]

একদিন মনোহরপুরের মিত্রদিগের খিড়কীর পুষ্করিণীতে দুইটী যুবতী সন্ধ্যার পূর্ব্বে গা ধুইতেছিলেন। যুবতীদ্বয়ের একের বয়স অষ্টাদশ বৎসর বলিয়া বোধ হয় এবং অপরটির পঞ্চদশ বৎসর। উভয়ে গা ধুইতে ধুইতে বয়োজ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হাঁ বৌ! এবার ঠাকুরপোকে এত জোরে বাড়ীতে আস্‌বার জন্য পত্র লেখা হোল, তিনি এলেন না কেন?"

কনিষ্ঠা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"দিদি, তিনি ত এবার যাবার সময় বোলেই গিয়াছিলেন যে, এবার এক্‌জামিন দিতে হবে, তাই তিনি আস্‌বেন না।"

জ্যেষ্ঠা বলিলেন,—"বাড়ী এলে কি পড়ার ক্ষতি হয়? তবে তুমি যদি ক্ষতি কর, সে কথা আলাদা বটে।"

কনিষ্ঠা এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"দিদি, তোমার ঐ এক কথা। ও সব কথা বল্‌লে আমার বড় লজ্জা করে। তা, সে কথা থাক্, তুমি যে আমাকে কি ব'ল্‌তে চেয়েছিলে।"

জ্যেষ্ঠা বলিলেন,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি যেন ব'ল্‌তে চেয়েছিলাম। এখন তা ত মনে প'ড়ছে না। রোস, মনে করি।"

কিন্তু সে কথা আর মনে হইল না। ইতিমধ্যে বাটীর মধ্য হইতে একটী দাসী আসিয়া পুকুরে উপস্থিত হইল এবং বধূদ্বয়ের প্রতি রাগ করিয়া বলিল,—"মেজবাবু বলেন যে, এতক্ষণ জলে থাকলে ব্যারাম হয়; কিন্তু তোমরা বাছা কি জেলের মেয়ে যে একতিল জল ছাড়া থাক্‌তে পার না?"

জ্যেষ্ঠা কোন উত্তর করিল না, কনিষ্ঠা বলিল,—"ঝি, আমার বাপের বাড়ী গঙ্গার উপরে তা ত জান, আমি ছেলে-বেলা থেকেই বড় জল ভালবাস্‌তাম। তাই সে অভ্যাস আজও ছাড়তে পারিনি।"

এই কথা বলিয়া দুই বউ ঝিয়ের সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গ্রামের নাম মনোহরপুর। এখন দেখিলে কেহই গ্রামখানিকে 'মনোহর'পুর বলিবেন না, তাহা জানি। কিন্তু তাই বলিয়া ত গ্রামের নাম আর বদল করা চলে না। এখনই না হয় গ্রামখানি ম্যালেরিয়ার প্রিয়-নিকেতন; এখনই না হয় গ্রামখানি জঙ্গলে পরিপূর্ণ; পচা পানাপুকুরে গ্রামখানির সর্ব্বনাশ করিতেছে; এখনই না হয় দূরে-দূরে দুই চারি ঘর দরিদ্র গৃহস্থ ভগ্নকুটীরে বাস করিয়া দুর্ব্বহ জীবন যাপন করিতেছে; এখনই না হয় মধ্যে মধ্যে ইষ্টকস্তূপের অন্তরালে ব্যাঘ্র-ভল্লুক-শূকর পাকা মোকাম করিয়াছে; এখনই না হয় সন্ধ্যার পর হিংস্র জন্তুর ভয়ে কেহ পথে চলাফেরা করিতে সাহস করে না। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন এই মনোহর-

পুর গ্রামে ঘনবসতি ছিল; পানীয় জলের পু

যাইত; সন্ধ্যার সময় কাঁসর-ঘণ্টার রবে গ্রামখানি মুখর হইয়া উঠিত; দুর্গোৎসবের সময় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশখানি বাড়ীতে মায়ের আগমন হইত; রাস্তা-ঘাটে লোকজন চলিত, গ্রামের অধিবাসীদিগের অন্নকষ্ট ছিল না; গ্রামের উপর মা-লক্ষ্মীর কৃপা ছিল; মা-সরস্বতীও বিমুখ ছিলেন না—গ্রামে আটদশখানি চতুষ্পাঠী ছিল। আর মিত্র মহাশয়েরা গ্রামের মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী-সম্পন্ন ছিলেন।

এই বংশে ফকিরচাঁদ মিত্র ও গোরাচাঁদ মিত্র দুই ভাই ছিলেন। যৌবনকালেই ফকিরচাঁদের মৃত্যু হওয়ায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোরাচাঁদই সংসারের কর্ত্তা হ'ন এবং তাঁহারই নাম দেশে রাষ্ট্র হয়। গোরাচাঁদ মিত্রের জমিদারী প্রকাণ্ড; ইহা ব্যতীত তেজারতী কারবারও আছে, ৫।৭ খানা বড় নৌকা আছে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কারবারের আড়ত আছে। গ্রামের মধ্যে বনিয়াদি ঘর বলিয়া তাঁহার বাড়ীকে লোকে সাধারণতঃ "বড় বাড়ী" বলিত। ফকিরচাঁদ যদিও যৌবনবয়সেই পরলোক গমন করেন, তথাপি তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছিল; পুত্রের জন্মের ৮ দিন পরেই ফকিরচাঁদের স্ত্রী পরলোকগমন করেন এবং এক বৎসর গত হইতে না হইতেই ফকিরচাঁদেরও মৃত্যু হয়। সে সময়ে গোরাচাঁদের বয়স ২১ বৎসর। এই বয়সেই তাঁহার উপর বিষয়-কার্য্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের পালনের ভার পড়িয়াছিল। বড়মানুষের পুত্র গোরাচাঁদ অল্প বয়সেই বিবাহ করেন; তাঁহার

বয়স ৩০ হইতে না হইতেই তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মে। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটীর নাম তারকনাথ এবং কনিষ্ঠের নাম সুরেন্দ্রনাথ। ফকিরচাঁদের পুত্রের নাম কার্ত্তিকচন্দ্র। যখন তারকের বয়স ১০ বৎসর এবং সুরেন্দ্রের বয়স ৬ বৎসর তখন কাশরোগে গোরাচাঁদের মৃত্যু হয়। সে সময়ে কার্ত্তিকের বয়স ১৭ বৎসর। কার্ত্তিক এত দিন বাঙ্গালা পড়িয়াছিল। গোরাচাঁদ কার্ত্তিককে ইংরাজী পড়িতে দেন নাই; তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, কার্ত্তিককে তিনি জমিদারী এবং তেজারতী সমস্ত কার্য্য শিক্ষা দিবেন; কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইতে না হইতেই তিনি পরলোক গমন করায় কার্ত্তিককে লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া বিষয়-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তারক এবং সুরেন্দ্র বাঙ্গালা পড়িতে লাগিল।

ইহার অনেক দিন পরের কথা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইবে। পুষ্করিণীর ঘাটে যে দুইটী যুবতীর কথোপকথন পাঠক শুনিয়াছেন, তন্মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা তারকের স্ত্রী, নাম সুপ্রভা এবং কনিষ্ঠা সুরেন্দ্রের স্ত্রী, নাম রঙ্গিণী। তারক বাঙ্গালা ছাত্র-বৃত্তি পাশ করিয়াই লেখাপড়া শেষ করিয়াছেন, এখন তিনি নিজের কাজকর্ম্ম দেখেন। কারণ কার্ত্তিক একা কোন্ দিক দেখিবেন, মোকদ্দমা মামলার তদ্বির করিতেই তাঁহার অধিক সময় যায়। কেবল সুরেন্দ্রই কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এল-এ পড়েন। আমরা সে বৎসরের কথা বলিতেছি, সেবার তিনি এল-এ পরীক্ষা দিবেন। কার্ত্তিকের একটী কন্যা ও

তারকের একটী কন্যা হইয়াছে; কার্ত্তি
রাধারাণী এবং তারকের কন্যার নাম স্বর্ণপ্রভা।

মিত্র মহাশয়ের পরিবারে সকলেই আছেন এবং গৃহ যে সমস্ত কারণে অশান্তির আলয় হয়, তাহা কিছু বর্ত্তমান না থাকায়, মিত্র মহাশয়ের সংসারকে লোকে সোণার সংসার বলিত।

[২]

মিত্রদিগের বাটীতে দুইটী দোতালা ঘর; ইহা ব্যতীত পাকের জন্য এবং খাদ্যদ্রব্যাদি রাখিবার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন ঘর আছে। কোঠা দুইটীতে সম্প্রতি চুণের কাজ করাতে অতি সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু বাহিরের সৌন্দর্য্যে কি হয়, বাহির অপেক্ষাও ভিতর অধিক সুন্দর। বড়মানুষের বাটীতে সর্ব্বদা জিনিষপত্র যেরূপ চারিদিকে পতিত থাকে, বাজার হইতে জিনিষ আনিয়া চাকরেরা যেখানে ফেলিয়া রাখিল, সেইখান হইতেই খরচ হইল বা নষ্ট হইল, এ বাড়ীতে তাহা হইবার যো নাই। তারকের স্ত্রী এ সমস্ত বিষয়ে বড় নিপুণা; তাঁহার পারিপাট্যের কথা দেশ-খ্যাত। বাড়ীর দ্বিতলে যে কয়েকটী ঘর আছে, তাহা এমনই সজ্জিত যে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়; এমন সুন্দর বন্দোবস্ত অতি কম বড়মানুষের বাটীতেই আছে। শয়নগৃহগুলি পরিচ্ছন্ন। আমাদের দেশে শয়নগৃহে সমস্ত জিনিষই থাকে, কিন্তু সুপ্রভার সে প্রকার বন্দোবস্ত নহে।

প্রত্যেক শয়নগৃহে একখানি পালঙ্ক বা খাট এবং কাপড় রাখিবার আল্না; ইহা ব্যতীত সামান্য একটী বাক্স থাকে, কারণ সুপ্রভা সর্ব্বদাই বলিতেন,—"শোবার ঘরে নানা জিনিষ থাক্‌লে নিশ্চয়ই আরাম হয়।" অন্যান্য ঘরের ব্যবস্থাও সেই প্রকার। সামান্য একটী দ্রব্যও গোলমাল অবস্থায় থাকিবার যো ছিল না। সুপ্রভা প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বহস্তে দোতালার সমস্ত ঘর পরিষ্কার করিতেন; দাস-দাসীদিগের উপর তিনি কোন কাজ নির্ভর করেন না। কার্ত্তিকের স্ত্রীরও এই প্রকার স্বভাব; তবে তিনি নিজের কার্য্যেই সর্ব্বদা বিব্রত। তাঁহার কার্য্যের মধ্যে নিজের শরীর। সর্ব্বদাই অসুস্থ জন্য তিনি কোন কাজই করিতে পারেন না, এবং সুপ্রভারও ইচ্ছা নহে যে তিনি কোন কাজ করেন; অথচ বাটীর কেহ সমস্ত দিন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে, ইহা তিনি ভালবাসিতেন না। এই জন্য তিনি অবসর-সময়ে বড়বধূকে (কার্ত্তিকের স্ত্রী) সেলাইয়ের কাজ শিখাইতেন; তিনিও প্রফুল্ল মনে তাহা শিখিতেন। বাটীতে গৃহিণী অর্থাৎ তারকের মাতা বর্ত্তমান ছিলেন; তিন বউয়ের একজনেরও ইচ্ছা নহে যে, তিনি শ্রমসাধ্য কোন কার্য্য করেন; কিন্তু তারকের মাতা তাহা পারিতেন না; তাঁহাকে যদি কোন দিন সুপ্রভা কাজ করিতে নিষেধ করিতেন, তাহা হইলে তিনি বলিতেন,—"মা! এ সংসার ত তোমাদেরই আছে, তোমরাই করিবে, আমি আর ক দিন বাঁচিব, যে কয় দিন থাকি, সে কয় দিন তোমরা

একটু কম খাট, তাই আমার ইচ্ছা।" কিন্তু
শুনিতেন না; এবং সুপ্রভার দেখাদেখি ছোটবউও সেই প্রকার হইয়াছিলেন। যদিও ছোট বউয়ের বয়স মাত্র পনর বৎসর হইয়াছিল, তথাপি তিনি সেই সময়ে র[illegible]কার্য্যে অতি নিপুণা হইয়াছিলেন। ছোটবউয়ের রন্ধনের কথা শুনিয়া হয় ত অনেক পাঠিকা বলিবেন,—"ছি! বড়মানুষের মেয়ে কেন পাক করে? বাটীতে বামুন নাই? আর পাকের জন্য এত কথাই বা কেন?" কিন্তু আমি তাঁহাদের কথার সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোক-দিগের রন্ধনের সুখ্যাতিই সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনীয়। বিশেষ সুপ্রভার ন্যায় বউয়ের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে অনেককেই এ [illegible] বুঝিতে হইবে। তাঁহারা বড়মানুষের বউ বটে, কিন্তু সমস্ত কার্য্য নিজে করিতেন। এমন সুখের পরিবার দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। সুপ্রভা ছোটবধূ রঙ্গিণীকে নিজের কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসেন। রঙ্গিণীও সুপ্রভাকে বড় ভক্তি করেন। এমন সংসার যে কি সুখের তাহা সকলে অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। এই সমস্ত ব্যতীত সুপ্রভার এবং রঙ্গিণীর আর একটী বিশেষ গুণ ছিল; সেটী বড়মানুষের মেয়েদের মধ্যে বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। বাটীর চারিদিকে যে সমস্ত দরিদ্র লোক বাস করিত, তাঁহারা তাহাদের সংবাদ সর্ব্বদা লইতেন। যদিও সুপ্রভার বয়স অষ্টাদশ অতিক্রম করে নাই, যদিও তিনি এখনও সংসারের ভাবগতি বুঝিতে পারেন নাই,

তথাপি তাঁহার হৃদয় দয়ায় উৎস ছিল, পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সাগর উচ্ছ্বসিত হইত; প্রতিবেশীদিগের অভাব-মোচনের জন্ত তাঁহার বড়ই আগ্রহ ছিল।

[৩]

শ্রাবণ মাস। অতি-বর্ষায় মিত্রদের পুষ্করিণী জলে পরিপূর্ণ। গ্রামের ভিতরে পর্য্যন্ত জল আসিয়াছে, এমন কি মিত্রদিগের বাটীর নিকট পর্য্যন্তও নৌকা আইসে। ইহার উপর কয়েক দিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে গ্রাম্যপথ জল-কর্দ্দমে পরিপূর্ণ। দরিদ্র লোকেরা কোনমতে কায়ক্লেশে বাস করিয়া আছে। এমনি দিনে একদিন অপরাহ্নকালে একখানি পাল্‌কী লইয়া কয়েকজন বেহারা ভিজিতে ভিজিতে মিত্রদিগের কাছারী-ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময়ে কাছারী-ঘরে কয়েকজন চাকর এবং ৫।৭ জন অতিথি বসিয়া ছিল। ঝড়বৃষ্টির জন্ত বাবুদের মধ্যে কেহই বাহিরে আইসেন নাই। পাল্কী দেখিয়া চাকরদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"এ পাল্কী কোথা হইতে আসিল?" একজন বাহক বলিল,—"রাইগঞ্জ হইতে।" রাইগঞ্জ সুপ্রভার বাপের বাড়ী। চাকর এই কথা শুনিয়া বেহারাদিগকে বড় আদর করিল এবং তাহাদিগের নিকট হইতে রাইগঞ্জ হইতে আগত পত্র লইয়া বাটীর মধ্যে গেল। পত্রের শিরোনামায় কার্ত্তিক বাবুর নাম, কিন্তু চাকরটী কার্ত্তিক বাবুকে না দেখিয়া তারক বাবুর হস্তেই পত্র

দিল। তারক রাইগঞ্জের পত্র দে
আরম্ভ করিলেন। কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার শ্বশুর বড় পীড়িত। তিনি পত্র পড়িতে-পড়িতে বড় বিমর্ষ হইলেন। খবর ভাল নহে। সুপ্রভা এবং তারককে অবিলম্বে রাইগঞ্জে যাইবার জন্য পত্র আসিয়াছে, তবে একখানি পাল্কী পাঠাইবার কারণ এই—যদি পাল্কী পাইতে দেরী হয় তবে অন্ততঃ একজন শীঘ্র রওনা হইতে পারিবেন। তারক পত্র পাইয়া মহাবিপদে পড়িলেন; আগামী কল্য জেলায় না গেলে কাজের বড় ক্ষতি এবং যদি রাইগঞ্জ না যান তাহা হইলে শ্বশুরের সঙ্গে দেখা আর বোধ হয় এ জন্মে হয় না। তারক নানা চিন্তা করিতে করিতে দাদাকে পত্র দিবার জন্য বাহিরে যাইতেছেন, সিঁড়ির মধ্যে সুপ্রভার সহিত দেখা হইল। সুপ্রভা কার্ত্তিকের কন্যা রাধারাণীকে কোলে লইয়া এবং নিজের কন্যা স্বর্ণের হাত ধরিয়া দোতালায় উঠিতেছিলেন। সিঁড়ির মধ্যে তারককে দেখিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এতক্ষণে বুঝি ঘুম ভাঙ্গল, আমি মনে কোরেছিলাম বুঝি আজ আর উঠা হবে না।" তারক অন্যমনস্ক ভাবে "হুঁ" মাত্র বলিয়া নামিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুপ্রভা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি অন্যমনস্ক। সুপ্রভা ব্যগ্র হইয়া আরও একসিঁড়ি নামিয়া বলিলেন,—"দেখ, তোমাকে গোড়ায় দেখে মনে করেছিলাম, বুঝি ঘুম থেকে উঠেছ বলেই মুখ এমন ভার হোয়েছে; কিন্তু তা ত নয়, তোমার মনে যেন কি

ভাবনা হয়েছে। আমায় বলবে না?" তারক দেখিলেন দাদাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যে কথা সুপ্রভাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না, সে কথা তাঁহার মুখের ভাবেই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন তিনি স্থিরস্বরে বলিলেন,—"না, এমন কিছু না; তুমি উপরে যাও, আমি মুখ ধুয়ে এসে সব বল্‌ছি।" এই বলিয়া তারক তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন। সুপ্রভা কিছু বুঝিতে পারিলেন না, একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিলেন, কিন্তু পাছে উপর হইতে কার্ত্তিক নামিয়া আইসেন, এই ভয়ে আস্তে আস্তে উপরে চলিয়া গেলেন। সুপ্রভা কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন তারক সহজে এত গম্ভীর হন নাই; আর সাংসারিক কোন কারণেও তাঁহাকে এত বিচলিত করিতে পারে না। এই জন্যই বাটীর সকলে এবং গ্রামের সকলে তাঁহার স্বামীকে ভালবাসিয়া এবং আদর করিয়া "মহেশ্বর" বলিয়া ডাকে। সুপ্রভা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ভাবিয়া ফেলিলেন। যে স্বামীর মুখ এতটুকু মলিন দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়েন, আজ সেই স্বামীকে বিমনা এবং প্রগাঢ় চিন্তায় অভিভূত দেখিয়া তাঁহার মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তারক নীচে যাইয়া হাতমুখ ধুইলেন এবং কাছারীবাটীতে যাইবার জন্য বাহিরে যাইতেছেন, এমন সময়ে কার্ত্তিককে দেখিতে পাইলেন। তিনি অমনি সেই পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিলেন।

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাকার পত্র?"

"রাইগঞ্জের।"

কার্ত্তিক পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন "তাই ত! বিষম সঙ্কট। তোমাকে কাল জেলায় না গেলে ওয়ারেণ্ট বাহির হইতে পারে, এ দিকে রাইগঞ্জে না গেলেও নয়। তা' এক কর্ম্ম কর, ক্ষেপীর মাকে এখনই পাঠাইয়া দিই; তুমি কাল বৈকালে ঐ রাস্তায় রাইগঞ্জ যাইও।" তারক সেই ভাল যুক্তি বিবেচনা করিয়া বাটীর মধ্যে ফিরিলেন; কার্ত্তিক বেহারাদিগের নিকট সবিস্তার শুনিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

এদিকে তারক তাড়াতাড়ি উপরে গেলেন, দেখেন সুপ্রভা তাঁহার জন্য সিঁড়ির দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। তারক তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন,—"দেখ! বড় বিপদ; তোমার পিতার বড় ব্যামো, তাই তোমাকে এখনই লইয়া যাইবার জন্য বেহারা এসেছে।" সুপ্রভা পিতার ব্যারামের কথা শুনিয়া একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং যখন শুনিলেন যে ভাসুর তাঁহার বাপের বাড়ী যাওয়ার আদেশ দিয়াছেন, তখনই তিনি নীচে নামিয়া রান্নাঘরে শাশুড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কারণ, শাশুড়ীকে না বলিয়া তিনি কোন কাজ করিতে আজিও শিখেন নাই। তিনি অতি ধীরস্বরে কহিলেন,—"মা! আমার বাবার বড় ব্যামো, তাই আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেহারা পাঠাইয়াছেন।" শাশুড়ী বধূকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অনেক ভরসা দিয়া বলি-লেন,—"ভয় নেই মা, তোমার বাবা ভাল হয়ে যাবেন।

কিন্তু তুমি এখনই রওনা হও মা !" এই বলিয়া তিনি তাঁহার যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সুপ্রভা সেই মেঘের মধ্যেই শেষবেলায় পিতাকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। প্রতিবেশী দুই একজন এমন দিনে এই অবেলায় যাইতে নিষেধ করিল, কিন্তু তারকের মা সে কথা শুনিলেন না, বলিলেন,—"না, আর দেরী করা হবে না; কি জানি, ঠাকুর না করুন, একটা যদি ভাল মন্দ হয়, তা হ'লে বৌমার আর আক্ষেপের সীমা থাক্‌বে না।"

রাইগঞ্জ হইতে যদিও চাকর হরিহর আসিয়াছিল, তবুও কার্ত্তিক বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য—তাঁহাদের বাপের আমলের চাকর রাধানাথকে সঙ্গে দিবার অভিপ্রায় করিলেন।

রাধানাথ ভৃত্য হইলেও ভৃত্যের মত থাকে না; সে বাড়ীর অভিভাবক। কার্ত্তিক, তারক, সুরেন্দ্র সকলেই তাহাকে 'রাধু কাকা' বলিয়া ডাকেন এবং রাধানাথ নিরক্ষর হইলেও তাহার পরামর্শ ব্যতীত তাঁহারা কোন কাজ করেন না। তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের জমিদারীর সমস্ত সংবাদ রাধানাথ জানে, তাঁহাদের তেজারতির সমস্ত অবস্থা রাধানাথ অবগত। স্বর্গীয় গোরাচাঁদ বাবু রাধানাথকে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মনে করিতেন। ছেলেরাও রাধানাথকে তেমনই সম্মান করিয়া থাকে। বাগদীর ছেলে রাধানাথ বাবুদের কাছে যে সম্মান পাইত, এখনকার দিনে জমিদার বাবুদের নিকট তাঁহাদের ম্যানেজার, দেওয়ানেরও সে সম্মান নাই।

রাধানাথ যখন শুনিল যে [illegible] যাইতে হইবে, তখন সে আপনা হইতেই সাজিয়া আসিল এবং কার্ত্তিককে বলিল,—"এমন অবেলায় যখন যেতেই হবে, তখন এ বুড়া সঙ্গে না গেলে চল্‌বে কেন? মাকে কি অমনি যেতে দিতে পারি, কেমন ভাই হরিহর।" রাইগঞ্জের চাকর হরিহর বলিল,—"তা রাধু কাকা, তুমি বুড়া মানুষ, কষ্ট ক'রে না গেলেও পারতে; আমিই সঙ্গে আছি।"

[৪]

সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে একখানি পালকী রাইগঞ্জের রাস্তার উপর দিয়া যাইতেছিল; একে শ্রাবণ মাস, চারিদিক জলে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার আকাশে মেঘ, অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। মনোহরপুর হইতে রাইগঞ্জ যাইবার একটিই রাস্তা এবং রাস্তাটী বরাবর রাইগঞ্জ পার হইয়া উত্তর দিকে গিয়াছে। বেহারারা বড় সাবধানে যাইতেছিল; মেটে রাস্তা বড় পিচ্ছিল হইয়াছিল, তাই মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট স্বরে পরস্পরকে হুঁসিয়ার করিতেছিল। রাধানাথ পাল্‌কীর পশ্চাতে ছিল। পথে চলিবার সময় রাধানাথের একটা বড় বদ্ অভ্যাস ছিল, সে গান না করিয়া থাকিতে পারিত না। আজ যে এমন দুর্গম পথে যাইতেছে, তবুও সে গান করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। বুড়া হইলে কি হয়, এখনও

তাহার শরীরে বল আছে, গলায় জোর আছে, আওয়াজও নরম হয় নাই। সে গান গাইতেছে—

"রবে না দিন চিরদিন সুদিন কুদিন
একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বৃষ্টি কিছু আস্তে-আস্তে হইতেছিল, কিন্তু ক্রমে যতই অন্ধকার বাড়িতে লাগিল, ততই বৃষ্টিও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পালকীতে আটজন বেহারা এবং সঙ্গে রাধানাথ ও রাইগঞ্জের চাকর 'হরিহর'। কিছুদূর কষ্টেস্বষ্টে যাইয়াই রাধানাথ হাঁকিয়া বলিল "ওরে সুবল! বড় রাস্তা ছেড়ে এই মাঠ আড়াআড়ি ধর না, বড় যে ঝড় উঠে এল।" একজন বেহারা বলিল "মাঠে যে জল দাঁড়িয়েছে"। রাধানাথ বলিল "তোদের ভয়নাই, জল খুব কম, হাঁটুও ডুববে না, আমি এগুতে যাচ্ছি।" পালকির মধ্যে সুপ্রভা, তাহা বোধ হয় পাঠক-পাঠিকা বুঝিতে পারিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তও সুপ্রভা এক এক বার পালকীর দ্বার খুলিয়া রাইগঞ্জ কতদূর দেখিতেছিলেন; কিন্তু এখন অন্ধকার হওয়ায় আর দেখিতে পাইতেছিলেন না। তিনি বেহারাদের সঙ্গে রাধানাথের কথোপকথন শুনিতে পাইয়া ভিতর হইতেই মাঠের রাস্তা ধরিতে আদেশ করিলেন। বেহারাগণ অগত্যা বাঁধা রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের রাস্তায় নামিল।

রাধানাথ যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঠিক, জল অর্দ্ধ হস্তের বেশী নহে। কিন্তু তাহারা যাইতে পারিতেছিল না; একে অন্ধকার তাহাতে মাঠের রাস্তা। দুই একজনের দুই একবার

উপায় নাই। মাকে আর তাঁর এই মেয়েকে আজ যেমন করিয়া হউক বাঁচাইতেই হইবে।”

হরিহর অনেকদিন সুপ্রভার বাপের বাড়ীতে কাজ করিতেছে। সে বলিল “যেমন কোরে হোক এদের রক্ষা করিতেছি।” হরিহর তখন মেয়েটীকে ভাল করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে গ্রামের দিকে দৌড়িল। স্বর্ণ কাঁদিতে লাগিল, হরির তাহাতে কর্ণপাতও নাই। রাধানাথ সুপ্রভার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু তাহারা এই জলবৃ[illegible] এমন স্থানে, এ ভাবে আর কতক্ষণ থাকিবে। সেই সময়ে বৃষ্টি একটু কম হইয়া আসিল। রাধানাথ বলিল “মা! আর ত উপায় দেখি না; তুমি যদি সম্মত হও তোমাকে আজ পিঠে করিয়া গ্রামে লইয়া যাই, আমার শরীরে এখনও সামর্থ্য আছে।” সুপ্রভা প্রথমতঃ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অস্বীকার করিলেন, কিন্তু রাধানাথ শেষে অন্য উপায় না দেখিয়া বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি বলিলেন “রাধু কাকা, আমি তোমার গায়ের উপর ভর দিয়া যাই।” রাধানাথ তাহাই স্বীকার করিল।

এইভাবে যাইতে-যাইতে গ্রামের নিকট উপস্থিত হইয়া সুপ্রভা দেখিলেন, হরি একটী লণ্ঠন হাতে করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে উৰ্দ্ধশ্বাসে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই সুপ্রভা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“হরি! বাবা কেমন?” হরি কাঁদিতে-কাঁদিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “দিদি-ঠাকরুন! কর্ত্তা

নেই।” এই কথা শুনিয়া সুপ্রভা “বাবা গো” বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। হরি এবং রাধানাথ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গেল।

[৫]

রাইগঞ্জের দীননাথ ঘোষের নাম সকলেই জানে। তিনি গ্রামের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি। তাঁহার বিলক্ষণ লাভের একটী জমিদারী আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার দুইটি কন্যা ব্যতীত কোন পুত্রসন্তান নাই। তাঁহার স্ত্রী বহু দিন পূর্ব্বে মারা যাওয়ায় তিনি কন্যা দুইটীকে বড় যত্নে লালনপালন করিয়াছেন। কন্যা দুইটীর মধ্যে বড়টী আমাদের সুপ্রভা এবং কনিষ্ঠা কন্যার নাম বিমলা। বিমলাকে শ্বশুরের ঘর করিতে হইত না, কারণ দীননাথ ঘোষ ঘরজামাই রাখিয়াছিলেন। এই কারণে, দীননাথ ঘোষ মৃত্যুকালে বিমলার নামেই জমিদারীর অধিকাংশ লিখিয়া দিয়া যান; অবশিষ্ট অংশ ও নগদ কয়েক হাজার টাকা সুপ্রভার নামে লিখিয়া দেন।

পিতার মৃত্যুর দিন রাত্রে জলে ভিজিয়া এবং অত্যধিক পরিশ্রমে বাটী পৌছিয়াই সুপ্রভা ও স্বর্ণ পীড়িতা হইয়া পড়েন; তাহার উপর প্রচলিত রীতি অনুসারে তিন রাত্রি পরে স্বর্গীয় পিতার শ্রাদ্ধাদি সমাধা করিয়া সুপ্রভা একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। এদিকে কন্যাটির অবস্থাও অধিকতর বিষম হইয়া উঠিল।

গ্রামের প্রাচীন কবিরাজের দ্বারাই তাহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে ফল হওয়া ত দূরের কথা, রোগ ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

মনোহরপুরে সংবাদ গেল। কার্ত্তিক তাঁহার প্রাণাধিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীর অবস্থা শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং কলিকাতা হইতে সুচিকিৎসক লইয়া গৌরীপুরে যাইবার জন্য সেই দিনই কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। তিনি পরদিনই ডাক্তার এবং ছোট ভাই সুরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গৌরীপুরে উপস্থিত হইলেন। পল্লীগ্রামের অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যেও এই একটা দারুণ কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা রোগীর পরমায়ু প্রায় নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল।

কলিকাতার ডাক্তার স্বর্ণকে দেখিয়া, তাহার রোগ পরীক্ষা করিয়া চোখমুখ বিকৃত করিলেন। অন্তরাল হইতে সুপ্রভা সমস্তই দেখিতেছিলেন, ডাক্তারের মুখ দেখিয়া মেয়ের অবস্থাটা অনুমান করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

ডাক্তার ঔষধ দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলে সুপ্রভা সেইখানেই জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে সর্ব্বব্যাধির শেষ চিকিৎসক ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন।

এটী উপন্যাসের কথা নহে; পৃথিবীতে যদি কিছু সত্য থাকে, তবে এইটী সেই সত্য। যখন বিপদে পতিত হইয়া

লোকে কূলকিনারা দেখিতে পায় না; যখন শোকের দারুণ সন্তাপে হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়, যখন পৃথিবী চক্ষের উপর ঘুরিয়া যায়, যখন হৃদয়ের মধ্যে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, সে সময় যে একবার পরমেশ্বরের নাম করিয়া ডাকে; হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করিয়া একবার সেই নাম ধরিয়া ডাকিতে পারে, তাহার হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা নিবিয়া গিয়া হৃদয় শান্ত হয়। সুপ্রভা আজ কয়েক দিন পর্য্যন্ত আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বর্ণকে লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, স্বর্ণের ব্যারাম ক্রমেই যে গুরুতর হইতেছিল তাহাও তিনি বুঝিতেছিলেন। আজ ডাক্তারের নির্ব্বাক মুখের উপর ভয়ের সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট দেখিয়া জগদীশ্বরের চরণতলেই কন্যার পরমায়ু প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; নিজের অসুখ ভুলিয়া গেলেন।

জগদীশ্বরের পদতলে মায়ের কাতর-প্রার্থনা গিয়া বোধ করি পৌঁছিল। ডাক্তারের ঔষধেই কয়েক দিনের মধ্যেই স্বর্ণ অনেক সুস্থ হইল। তখন কার্ত্তিক সকলকে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

বাটী আসিয়াই সুপ্রভা মেয়ে লইয়াই বিব্রত হইয়া রহিলেন, সংসারের কোন কাজেই হাত দিতে পারিলেন না। এতদিন পর্য্যন্ত এ বোঝা তিনিই বহিয়াছিলেন, এই বিপদের দিনে সে ভার আসিয়া পড়িল ছোটবধূ রঙ্গিনীর উপর। রঙ্গিনী অক্ষুব্ধ চিত্তে সমস্তই করিত। এই দিনরাত পরিশ্রমে তাঁহার কোন দুঃখ কোন ক্ষোভ ছিল না। কাজ করিয়াই

সে আনন্দ পাইত। শুধু একটা তাহার বড় ক্লেশের কারণ উপস্থিত হইয়াছিল; তাহার স্বামীর প্রায় মাসাধিক কাল কলেজ কামাই হইয়া গেল। সে দুঃখিত মনে প্রায়ই ভাবিত, এবার বুঝি তিনি পরীক্ষায় পাশ হইবেন না। স্ত্রীর নিকট স্বামীর সুনাম ও খ্যাতি যত আদরের, এমন আর কিছুই নহে। তাই সে কায়মনোবাক্যে সুরেন্দ্রের উন্নতির জন্যই সর্ব্বদা প্রার্থনা করিত। এতদিন পর্য্যন্ত স্বর্ণের পীড়ার জন্য সুরেন্দ্রের সঙ্গে রঙ্গিনীর ভালরূপ দেখা শুনা হয় নাই, সুপ্রভারও সেদিকে খেয়াল ছিল না; আজ মেয়েকে নীরোগ দেখিয়া এই কথাটা মনে পড়িয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

তিনি অপরাহ্নকালে স্বহস্তে সুরেন্দ্রের ঘর পরিষ্কার করিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি অন্যত্র থাকায় এই সব ঘরে কেহ বড় বেশী যায় নাই। ঘরদ্বার বিছানাপত্র সমস্তই বিশৃঙ্খল ও শ্রীহীন হইয়াছিল।

স্বর্ণের পীড়া হওয়া অবধি রঙ্গিনী শাশুড়ীর কাছে থাকিত, কারণ সুরেন্দ্র স্বর্ণের নিকট অধিকাংশ সময়ই থাকিতেন। এ দিকে সুরেন্দ্রের কলিকাতায় যাওয়ার দিন স্থির হইয়াছে, অথচ এতদিন বাটীতে থাকিয়াও একটী দিনও রঙ্গিনীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইতে পারে নাই, জানিতে পারিয়া সুপ্রভা মনে মনে দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন। হয় ত পাঠক-পাঠিকাগণ বলিবেন যে "এক বাড়ীতে এতদিন থাকিল, অথচ দেখা হইল না, এ কেমন কথা?" কিন্তু ইহাই ঘটিয়া থাকে।

রঙ্গিনী এই শিক্ষাই পাইয়াছিল। যদিও সে দেখিত যে, অনেক সময়ে কার্ত্তিক স্ত্রীর সঙ্গে দিবাভাগেই কথা বলেন, এবং সুপ্রভাও তারকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন ; কিন্তু রঙ্গিনী তাহা পারিত না। সে সুরেন্দ্রকে দেখিলে সলজ্জভাবে প্রস্থান করিত। কখনও দিবাভাগে তাঁহার সহিত কথা কহিত না ; তাহার ভয় ছিল পাছে কেহ তাহাকে নির্লজ্জা বলে। যদি কখনও ঘটনাক্রমে নিরালায় স্বামীর সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া যাইত, তাহা হইলে সে কেবলমাত্র সুরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়াই পলায়ন করিত।

আজ সকাল-সকাল সুরেন্দ্র নিজের ঘরে শয়ন করিতে গেলেন। ঘরের এক পার্শ্বে একখানা টেবিল; এক কোণে পিলসুজের উপর একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে ; অপর পার্শ্বে একখানি পালঙ্ক ; ঘরে গিয়া সুরেন্দ্র সেই টেবিলের নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত বাটীতে আসিয়া তিনি একেবারেই পড়াশুনা করিতে পারেন নাই। তাই আজ পুস্তক লইয়া বসিলেন বটে, কিন্তু মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। ঘরের মধ্যে কাহার দুটি চরণপাতের মৃদুশব্দের আশায় উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। রঙ্গিনীও আজ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত গৃহকার্য্য করিতেছিল এবং অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত নিঃশেষ করিয়া মেয়েদের জন্য সকালবেলার খাবার লইয়া উপরে গেল। গিয়া দেখিল কার্ত্তিক এবং তারক পূর্ব্বাহ্লেই নিজেদের ঘরে চলিয়া গিয়াছেন। তখন আস্তে

আস্তে সে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। দেখিল সুরেন্দ্র একখানি পুস্তক লইয়া বসিয়া আছেন। রঙ্গিনী ধীরে ধীরে যাইয়া চেয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইতেই সুরেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাজ সব শেষ হ'ল ?"

রঙ্গিনীও মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "আমাদের মেয়েমানুষের কাজের কখনো শেষ হয় কি !"

সুরেন্দ্র। তোমাকে আর বাইরে যেতে হবে কি ?

রঙ্গিনী। না; আমি আজ তোমার জন্যে সমস্ত কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে এসেছি। সত্যই কি তোমার যাওয়ার দিন স্থির হয়েছে ?

সুরেন্দ্র। তুমি কি তবে আমাকে আরও দুই এক দিন থেকে যেতে বল ?

রঙ্গিনী। বলা ত দূরের কথা, আমি সে কথা মনেও করি নাই। তোমার যাতে সুখ্যাতি হয়, যাতে দশজনে তোমাকে ভাল বলে, যাতে তুমি গণ্যমান্য হ'তে পার, তাতে কি আমার বাধা দেওয়া উচিত ? আমি সে জন্যে বল্‌ছিলাম না; এবার তোমার পরীক্ষার বৎসর, এতদিন দেরী হয়ে গেল, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

সুরেন্দ্র। রঙ্গিনী ! এতদিন তোমাকে কোন কথাই বল্‌তে পারিনি; কিন্তু তোমাকে আজ কয়েকটি কথা শুন্‌তে হবে এবং সেই অনুসারে কাজ করতেও হবে।

রঙ্গিনী। কি বল। আমি কবে তোমার কথা অন্যথা করেছি ?

সুরেন্দ্র। দেখ তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। তুমি এমন বুদ্ধিমতী, এত কথা বুঝতে পার, আর এইটি বোঝ না? লেখাপড়া শেখা যে উচিত, এ কি তোমার মনে হয় না ?

রঙ্গিনী। সে কি আমি বুঝি না ? কিন্তু আমি গোড়ায় যত্ন করি নি, তাই এখন মন লাগে না, কেমন যেন বিরক্তি বোধ হয় ; মেজদি কত চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই আমার ইচ্ছা করে না।

সুরেন্দ্র। ভেবে দেখ তোমার লেখাপড়া না শিখায় কত কুফল হতে পারে। মনে কর, তোমার যে সব সন্তান হবে, তাদের শিক্ষার ভার তোমার উপরে থাকাই কর্ত্তব্য। যদি অন্য দেশের কথা শোন, তা হ'লে অবাক্ হবে। অন্য দেশে যে সমস্ত বড় বড় লোক জন্মেছেন, তাঁরা বাল্যকালে মায়ের কাছেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন। মা যদি লেখাপড়া না জানে, তা'হলে সন্তানের ভাল শিক্ষা কখনও হয় না। অন্য প্রমাণের আবশ্যক কি, মেজবউদিদিকে দেখলেই ত সব বুঝতে পার। তিনি লেখাপড়া শিখেছেন বলে তাঁর মন কেমন সরল, পবিত্র এবং তাঁর কাজ দেখলে চক্ষু জুড়ায়। আর ঘোষেদের বাটীর বউদের ব্যবহার দেখ দেখি, তারা দিবা-রাত্রি ঝগড়া-বিবাদেই আছে। অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক সংসারে

থাক্‌লে নানাপ্রকার গোলযোগ হতে পারে। এখন বুঝেছ, কেন তোমাকে লেখাপড়া শিখতে বলি।

রঙ্গিনী। তা সব বুঝি; কিন্তু কি জন্য যেন ও-সবে বড় মন যায় না। আমার ইচ্ছা করে দিন-রাত্রি সংসারের কাজ করি, শাশুড়ী-ননদের সেবা ভক্তি করি এবং আর-আর কাজ করি।

সুরেন্দ্র। সে গুলি ত অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু অবসর-সময়ে কি কর্‌বে ?

রঙ্গিনী। তখন আর কি, গল্প হাসি খেলা কর্‌ব।

সুরেন্দ্র। সে সময়টা ঐ সকল বাজে কাজে নষ্ট না ক'রে যদি লেখাপড়া শিক্ষা কর, সে কি ভাল নয় ?

রঙ্গিনী। তা, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক কর্‌ছি না। আচ্ছা স্বীকার করছি, এখন থেকে দিদির কাছে লেখাপড়া শিখ্‌ব।

সুরেন্দ্র। দেখ, যেদিন তুমি আমাকে আপনার হাতে পত্র লিখতে পার্‌বে, সেই দিন আমি তোমাকে খুব একটা ভাল জিনিষ দেব।

রঙ্গিনী। আমাকে লোভ দেখাতে হবে না। তোমার যখন এত ইচ্ছা, তখন আমি যেমন ক'রে পারি লেখাপড়া শিখব। দেখ, তুমি এবার পূজায় বাড়ী এসো না। তা'হলে আবার অনেক সময় নষ্ট হ'বে ; এই দেখ কতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করলে। আচ্ছা, আর এক কথা। মনে কর তুমি পাশ কর্‌লে ; তার পরে কি কর্‌বে ?

সুরেন্দ্র। কেন, বি এ পড়ব।

রঙ্গিনী। বি এ প'ড়ে কি কর্‌বে? আমার বাবা বলেন যে আজকাল আর বি এ এমের ভাত নেই।

সুরেন্দ্র। তা না থাকুল। রঙ্গিনী! তোমার এইটী বড় ভুল। সকল লোকেরই যদি টাকা উপার্জ্জনই লেখাপড়ার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমাদের অবস্থা বড় মন্দ। তুমি কি মনে করেছ লেখাপড়া শিখে আমি চাকরী করব; তা কিছুতেই নয়। আমি চাকরীকে বড় ঘৃণা করি। পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমাদের যা' আছে, তাই ভাল কোরে দেখে চল্‌তে পার্‌লে অন্যের দ্বারস্থ হতে হবে না। আমি চিরকাল লেখাপড়াতেই জীবন কাটাব।

রঙ্গিনী। সে ত ভালই। তবে কি জান, মা বল্‌ছিলেন যে, বি এ, এম এ পাশ করা অপেক্ষা ডাক্তারী শেখাই ভাল। আমিও তাই ভাল বুঝি। কেন তা বুঝেছ? আজকাল যে সব ডাক্তার আমাদের দেশে আসে, তারা যেন কি। সে-বার ঐ কলিকাতা থেকে কে একজন ডাক্তার আমাদের গাঁয়ে ঘোষালদের বাড়ীতে চিকিৎসা কর্ত্তে এসেছিল। মাগো! সে যে কি ঢলান টা ঢলালে, তা তোমার কাছে বল্‌তে আমার গা শিউরে উঠে। সেই দিন থেকে মনে করেছি যে, ব্যারামে ম'রে যাব তাও স্বীকার, তবু পুরুষ-ডাক্তারকে হাত দেখাব না।

সুরেন্দ্র। বাস্তবিক রঙ্গিনী! তুমি ঠিক বলেছ। আমারও দুই এক সময়ে তাই ইচ্ছা করে।

রঙ্গিনী। দেখ, তুমি যদি ডাক্তার হও, তা হোলে আমাদের নিজেদের জন্য মোটেই ভাবতে হয় না; বিশেষ গাঁয়ের যে কত উপকার হয়, তা আর বলা যায় না! সে দিন দাসেদের একটী ছেলের বিকার হোয়েছিল, গাঁয়ের কবিরাজ টাকা না হোলে যেতে চায় না। সে ছেলেটীর মা কাঁদতে-কাঁদতে আমাদের বাড়ীতে এসে সব বোল্‌লে; আমার বুক ফেটে গেল; আমি লুকিয়ে তাকে ৪টী টাকা দিয়ে কবিরাজ আনতে বলে দিলাম। আরও দিতে চেয়েছিলাম; কিন্তু হতভাগিনী কবিরাজ ডাক্‌তে-ডাক্‌তেই ছেলেটী মারা গেল। দেখ দেখি কি কষ্ট। তুমি ডাক্তার হলে কি ছেলেটি অচিকিৎসায় মরে যেতো।

সুরেন্দ্র। রঙ্গিনী, তোমার বড় দয়ার শরীর। তোমার আজকের এই কথা শুনে যে আমি কতদূর সন্তুষ্ট হলেম, তা আর বলতে পারি না। আমি বি এ পড়া ছেড়ে দেব। তোমার ন্যায় দয়াশীলা যা বিবেচনা করেছে, আমি তাতে মোটেই অমত করব না। তবে বড়দাদা কি বলেন তাই ভাবনা।

রঙ্গিনী। তিনি অমত করবেন না—আচ্ছা, এখন তুমি ঘুমাও, রাত্রি অনেক হল:

তৃতীয় দিনে সুরেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

[৬]

সুরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে যখন ইংরাজী স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন মহেন্দ্র নামে একটী বালকের সহিত তাঁহার

অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। মহেন্দ্র সুরেন্দ্রকে বড় ভাল বাসিতেন। উভয়ে এক স্কুলে পড়িতেন এবং মহেন্দ্র সুরেন্দ্রের তিন শ্রেণী উপরে পড়িতেন। উভয়ে অধিকাংশ সময়েই একত্র থাকিতেন। মহেন্দ্রের যে গ্রামে বাড়ী, সুরেন্দ্র সেই গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িতেন, কারণ সুরেন্দ্রের নিজ গ্রামে ভাল স্কুল ছিল না এবং কলিকাতায় যাইতে তাহার ইচ্ছা ছিল না। মহেন্দ্র দরিদ্রের সন্তান, সংসারে মা ব্যতীত তাহার আর কেহই ছিল না। মহেন্দ্রের মা অতি কষ্টে তাহাকে ইংরাজী স্কুলে পড়াইতেন। এই সময়েই মহেন্দ্রের সহিত সুরেন্দ্রের পরিচয় হয়।

কিছুদিন পরে মহেন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন এবং মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতায় এলে পড়িতে গেলেন। সুরেন্দ্র তাহার পরেও কিছুদিন সেই গাঁয়েই ছিলেন ; কিন্তু মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া আর অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না ; সুতরাং তিনিও মাস কয়েকের মধ্যেই কলিকাতায় পড়িতে গেলেন। সেখানে তাহাদের নিজেদেরই বাসা ছিল। কিন্তু মহেন্দ্র অপর একস্থানে থাকিয়া পড়িতেন।

এই দুটি বন্ধুর এ প্রকার অভিন্ন ভাব অনতিকাল মধ্যেই কার্ত্তিক এবং তারকের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ; এমন কি মহেন্দ্রকে তাঁহাদের নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রের বড় ইচ্ছা

যে মহেন্দ্র তাঁহার সঙ্গে একত্র থাকেন, কিন্তু নানা কারণে মহেন্দ্র এলে পরীক্ষা পর্য্যন্ত তাহা করিতে পারেন নাই। বিশেষ মহেন্দ্র যে ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার সমস্ত ব্যয়ভার নির্ব্বাহ হইত।

কিন্তু এল্, এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিবার আর যখন তাঁহার কোন উপায় রহিল না, তখন কার্ত্তিক তাঁহাকে সযত্নে নিজেদের বাসায় আহ্বান করিয়া লইলেন এবং তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। এই-রূপে দুই বন্ধু পুনরায় একত্র মিলিত হইলেন। মহেন্দ্র তখনও বিবাহ করেন নাই; বিবাহের কথা উঠিলেই তিনি নানাপ্রকার যুক্তি দিয়া বাধা দিতেন। শ্বশুরবাড়ী ছিল না, তাই তিনি কালেজের অবকাশে অর্দ্ধেক সময় নিজের বাটীতে এবং অর্দ্ধেক সময় সুরেন্দ্রের মনোহরপুরের বাড়ীতে গিয়া অতিবাহিত করিতেন।

সুরেন্দ্রের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্তও মহেন্দ্রকে বড় স্নেহ করিতেন। সুপ্রভা মহেন্দ্রকে নিজের সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। শ্রাবণ মাসে স্বর্ণর অসুখের সময়ে যখন সুরেন্দ্র বাড়ীতে আসেন, তখন মহেন্দ্রও আসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময়ে তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় সুরেন্দ্র তাঁহাকে আসিতে দেন নাই। বাড়ী আসিয়া সুরেন্দ্র প্রায় প্রতিদিনই তাঁহাকে স্বর্ণের খবর লিখিতেন।

[৭]

তাহার পরে দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, যাহা এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শুধু মহেন্দ্রের জীবনের গতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সংসারে তাঁহার একমাত্র বন্ধন ছিলেন মাতা। সেই মা যখন একদিন হঠাৎ পরলোকে চলিয়া গেলেন তখন মহেন্দ্র বি, এ পড়া ছাড়িয়া দিয়া একেবারে সুরেন্দ্রদের বাটী মনোহরপুরে আসিয়া বাস করিলেন। মনে মনে বলিলেন, আর পড়িয়া কি হইবে! যাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার জন্যই পাশ করা, তিনিই যখন নাই, তখন থাকুক এইখানেই সমস্ত বিদ্যালয়ের বোঝা। আমি আর এ বৃথা ভার বহিয়া বেড়াইব না। অথচ জীবিকার জন্য উপার্জ্জনেরও আবশ্যকতা ছিল না; এই কারণে তিনি মিত্রদের বাটীতেই রহিলেন।

সুপ্রভা তাঁহাকে ভ্রাতার অধিক ভাল বাসিতেন, তাই কোনমতেই তাঁহাকে অধিক দিন আলস্যে দিন কাটাইতে দিলেন না। তিনি বাটীর উপরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া তাহার সমস্ত ভার চাপাইয়া দিলেন মহেন্দ্রের উপর। তবে, নিজেও একেবারে ভারশূন্য রহিলেন না। দ্বিপ্রহরের অবকাশে রঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া মেয়েদের সূচের কাজ, গৃহস্থালীর কাজ শিখানো, তাহাদিগকে পরীক্ষা

করা, যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার দেওয়া, এই সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তা ছাড়া স্থপ্রভা বালিকাদিগকে মধ্যে মধ্যে টাকা দিতেন এবং সে টাকা তাহারা কিসে ব্যয় করে তাহার সন্ধান লইতেন। রঙ্গিনীও দিদির সমস্ত কার্য্যেই যোগ দিতেন। কার্ত্তিক ছোট বধূদ্বয়ের এই সমস্ত কার্য্য দেখিয়া আনন্দিত হইতেন এবং তাঁহাদের কার্য্যে যথোচিত উৎসাহ দিতেন।

বাটীর যে অংশে স্কুল হইত, তাহার উপরের ঘরেই মহেন্দ্র থাকিতেন। এই কামরা বাটীর মধ্যের দিকে, কিন্তু বাহিরেরও অতি নিকট। স্থপ্রভা এই ঘর মহেন্দ্রের জন্য নিজে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘরে মহেন্দ্র এবং তারক অধিক সময় একত্র কাটাইতেন। স্থরেন্দ্র যখন কলিকাতা হইতে বাটীতে আসিতেন, তখন তিনিও এই ঘরেই থাকিতেন। তারক এবং মহেন্দ্র সমবয়স্ক, স্থরেন্দ্র তাহাদের অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট, কাজেই উভয়ের সহিতই মহেন্দ্রের বিশেষ প্রণয় ছিল। মহেন্দ্র আর নিজ গ্রামে যাইতেন না, মনোহরপুরে মিত্র পরিবারভুক্ত হইয়াই জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এ ভাবে অধিক দিন কাটিল না। পৌষ মাসে হঠাৎ একদিন মহেন্দ্র জ্বরে পড়িলেন। প্রথম দুই তিন দিন সকলেই জ্বর সামান্য মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ক্রমেই যখন জ্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং মহেন্দ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন, তখন কার্ত্তিক এবং তারক উভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া

উঠিলেন। সুপ্রভা দিবারাত্রি রোগীর কাছে বসিয়া থাকিতেন; এক দণ্ডের জন্য তাঁহার কাছ ছাড়া হইতেন না; রঙ্গিনী কি করিবে, এক একবার বাটীর মধ্যে যায় এবং এক একবার মহেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে। গ্রামের কবিরাজ আসিয়া নাড়ী দেখিয়া যখন ইহাকে দুশ্চিকিৎস্য সান্নিপাত বিকার বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন সুপ্রভা কাঁদিতে লাগিলেন। রঙ্গিনী এতদিনও সুরেন্দ্রকে এ বিষয়ে কিছুই জানায় নাই। আজ সমস্ত বৃত্তান্ত কলিকাতায় সুরেন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইল। সুরেন্দ্র পত্রপাঠ মাত্র বাটীতে আসিলেন, এবং মহেন্দ্রের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তখনও মহেন্দ্রের জ্ঞানের বিশেষ বৈলক্ষণ্য হয় নাই; তিনি ধীরে ধীরে বন্ধুর হাত খানি টানিয়া লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন কথাই কহিতে পারিলেন না।

সুরেন্দ্র এখন ডাক্তারী পড়িতেছিলেন। তিনি বাড়ী আসিবার সময় নানা প্রকার ঔষধ আনিয়াছিলেন; বন্ধুর চিকিৎসার ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নৈপুণ্যে এবং সুপ্রভার অহর্নিশি অক্লান্ত সেবায় এবং সর্ব্বোপরি জগদীশ্বরের কৃপায় ২৫ দিন পরে মহেন্দ্রের বাঁচিবার লক্ষণ দেখা দিল। পীড়ার সময়ে মহেন্দ্র যখনই সুপ্রভার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, তখনই যেন তাঁহার পীড়ার যন্ত্রণা অনেক কমিয়া যাইত; তাঁহার বোধ হইত যেন কোন দেবকন্যা তাঁহার শিয়রে

বসিয়া তাঁহার রোগ-ক্লিষ্ট মুখে হাত বুলাইতেছেন। দিন যাইতে লাগিল; ক্রমে মহেন্দ্র সুস্থ হইতে লাগিলেন। এখন মহেন্দ্র হাঁটিতে পারেন। সুরেন্দ্র এতদিন পর্য্যন্ত বাটীতেই ছিলেন। এক্ষণে আর থাকা অনাবশ্যক মনে করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার কথা তারককে বলিলেন; তারক দাদাকে বলিয়া দুই দিন পরে যাত্রার দিন স্থির করিলেন। যাওয়ার যখন সমস্ত প্রস্তুত, এমন সময়ে এক নিদারুণ ঘটনায় বিনামেঘে বড়বাড়ীর মস্তকে কঠোর বজ্রপাত হইল।

সে দিন মঙ্গলবার। অপরাহ্নকালে সুরেন্দ্র কাছারী-সংলগ্ন বাগানের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই বাগান তারকের স্বহস্ত-নির্ম্মিত। তারক নিজে ভিন্ন-ভিন্ন দেশ হইতে নানা প্রকার বৃক্ষের কলম, বীজ প্রভৃতি আনিয়া এই বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এবং স্বহস্তে বাগানের সমস্ত কাজ করিতেন। বাগানটির প্রতি তাঁহার যত্নের অবধি ছিল না, এবং তাঁহারই যত্নে বাগানটী সুন্দর, সুদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আট দশ হাত অন্তর ছোট ছোট আম এবং কাঁটালের গাছ সারি দিয়া লাগান, এবং তাহারই মধ্যে মধ্যে ভাল-ভাল ফুলের গাছ, তরকারীর গাছ এবং অন্যান্য গাছ ছিল। বাগানের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বৃহৎ গর্ত্ত ছিল এবং সে গর্ত্তে বারমাসই জল থাকিত। এই দিক্‌টা কিছু জঙ্গলময়। বেত এবং অন্যান্য আগাছায় পরিপূর্ণ। তারক অনেক চেষ্টাতেও এই সমস্ত নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। আজ সুরেন্দ্রের পরামর্শে তারক সেই গাছগুলিতে

আগুন লাগাইয়া দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাগানের মধ্যে যাইয়া, অদূরে দাঁড়াইয়া ইহাই দেখিতেছিলেন। তারক নিকটেই কোথাও ছিলেন। হঠাৎ সুরেন্দ্রের চীৎকার শব্দে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন সুরেন্দ্র পা ধরিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। দাদাকে দেখিবামাত্র "আমাকে সাপে কামড়াইয়াছে" বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্তকালের জন্য তারক কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না, পরক্ষণেই নিজের কোঁচার কাপড় ছিঁড়িয়া সর্পদষ্ট স্থানের উপর ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেন এবং ভাইকে কোলে করিয়া বসিলেন। বাগানের মালী ছুটিয়া গিয়া এ দুঃসংবাদ বাটীর মধ্যে দিতেই কার্ত্তিক এবং অন্যান্য সকলে আসিয়া দেখিলেন বিবর্ণপ্রায় ছোট ভাইকে ক্রোড়ে লইয়া তারক কাঁদিতেছেন।

সকলে ধরাধরি করিয়া সুরেন্দ্রকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলে একটা মর্ম্মভেদী কান্নার রোল পড়িয়া গেল। জননী হাত পা আছড়াইয়া সুরেন্দ্রের বুকের উপর পড়িলেন; শুধু সুপ্রভা কাঁদিবার সময় নয় বুঝিয়া নীরবে আসিয়া সুরেন্দ্রের নিকটে বসিলেন; কার্ত্তিক দূরে সরিয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে গণ্ডগোল করিয়া কবিরাজ, বিষবৈদ্য, ওঝা ডাকিবার জন্য লোক ছুটিয়া গেল। কান্নাকাটী শুনিয়া মহেন্দ্র উপর হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন, এখনও তাঁহার দুর্ব্বলতা যায় নাই। নীচে আসিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিলেন না, সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। তারক কখনও

বা পাগলের ন্যায় নিরর্থক ছুটাছুটি করিতেছেন, কখনও বা "ভাই, দাদা, সুরেন" বলিয়া কাঁদিয়া কাছে আসিয়া বসিতেছেন। আজ তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। কার্ত্তিক হত-জ্ঞানের ন্যায় দূরে বসিয়া ভাবিতেছেন; এবং এক একবার বাহিরে গিয়া ওঝা আসিল কি না, দেখিতেছেন।

গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে যত বিষবৈদ্য ছিল, সকলেই আসিল, সকলেই চেষ্টা করিল; কিন্তু সব বৃথা হইল। কিছু-ক্ষণপরেই মিত্রবংশের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান সর্পবিষে সমাচ্ছন্ন হইয়া, এক হাত তারকের হাতে অপর হাত মহেন্দ্রের হাতে রাখিয়া, সুপ্রভার কোলের উপর মাথা রাখিয়া, ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন।

ইহার পরের দৃশ্য বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। মাতা বিগতপ্রাণ পুত্রের বুকের উপর পড়িয়া মূর্চ্ছিতা। কার্ত্তিক ও তারক শোকে উন্মত্ত। শুধু শোক করিলেন না মহেন্দ্র। এ ঘটনা বোধ হয় তাঁহার শোকের অতীত হইয়াছিল। তিনি শুধু দূরে সরিয়া গিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

[৮]

সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বিষহ, নারীজীবনের সর্ব্বশেষ যন্ত্রণা আজ ভগবান্ রঙ্গিনীর মাথায় তুলিয়া দিলেন। সে যখন শুনিল সুরেন্দ্রকে সাপে কামড়াইয়াছে, তখন তাহার হৃদয়ে যে কি শেল

বাজিল, তাহা যাহার সে অবস্থা না হইয়াছে সে বুঝিবে না। সে বেদনা লিখিয়া জানাইবার নয়, শুধু অন্তরে অনুভব করিবার। সে শেষ সময়ে স্বামীকে একবার জন্মের শোধ ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, একবার হৃদয় ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পায় নাই। এখনও প্রাণ খুলিয়া সে কাঁদিতে পর্য্যন্ত পারিতেছে না, শুধু মনের আগুনে অহর্নিশি জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছে। আজ তাহার জগৎ শূন্যময়, আকাশের চন্দ্র-তারকা জ্যোতিঃহীন। পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকার সংসারের সমস্ত সুখ ফুরাইয়া গেল, জীবনের দীপ মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। কিন্তু এ সকল চিন্তা তখন তাহার মনে উদয় হইয়াছিল কি না বলা যায় না। সে একটা কথা শুধু সারারাত্রি ধরিয়া ভাবিতে লাগিল "যে মরে তাহাকে কি আর দেখা যায় না? চিরদিনের জন্যই কি তাহার সব চলিয়া যায়? বুক চিরিয়া রক্ত দিলেও কি সে মুখ এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা যায় না? পৃথিবীময় খুঁজিলেও কি তাহাকে পাওয়া যায় না?" কিন্তু থাক্ তার কথা। বাঙ্গালীর ঘরের সদ্য বিধবা। তার ভাবনার কি পার আছে? তার ব্যথার কি অন্ত আছে? কিন্তু তবুও তাহার রাত্রি কাটে; তাহার কাছেও প্রভাত-সূর্য্য পূর্ব্ব-গগন রাঙা করিয়া আবার দেখা দেয়।

এই ত প্রকৃতির নিয়ম; জড় জগৎ মানুষের ধার ধারে না। তাহারা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখে নাই। আজ মিত্র পরিবারে যে বজ্রপাত হইয়াছে, যাহার আঘাতে মিত্র-

পরিবারের সকলে অবসন্ন, তাহার সহিতও কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। বরঞ্চ অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ যেন সূর্য্য আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, প্রকৃতির মুখ আরও যেন সজীব বোধ হইতে লাগিল।

মনোহরপুরের নীচেই একটি ক্ষুদ্র নদী। সে নদী কিছুদূর যাইয়াই পদ্মায় পড়িয়াছে। সেই নদীর তীরে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রের শব লইয়া সকলে উপস্থিত হইল। নদীতীরে লইয়া গিয়া সুরেন্দ্রের দেহ জলে বিসর্জ্জন দিয়া সকলে বাটীতে ফিরিল; শুধু একজন দূরে বসিয়া রহিল। যখন বাটী হইতে সকলে সুরেন্দ্রের মৃতদেহ লইয়া আসে, তখন তারক এবং মহেন্দ্রকে কেহ আসিতে দেয় নাই। তারক বাটীতেই সকলকে লইয়া ছিলেন; কিন্তু মহেন্দ্র সকলের অগোচরে আসিয়া নদীতীরে দূরে বসিয়া ছিলেন। যখন দেখিলেন সকলে সুরেন্দ্রের দেহ বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া গেল, তখন আস্তে আস্তে মহেন্দ্র আসিয়া সেই স্থানে বসিলেন। চিতা নাই, কারণ সর্পদষ্ট ব্যক্তির মৃতদেহ দগ্ধ করার প্রথা এ দেশে নাই। সকলে চলিয়া গেল; শ্মশানভূমি নিস্তব্ধ, দুই একজন কৃষক লাঙ্গল গরু লইয়া মাঠের দিকে যাইতেছে। মহেন্দ্র সেই-খানে বসিয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতার মুখ মনে পড়িল, জগৎসংসারে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন; এ জীবনে তাঁহার যাহা কিছু আপন ছিল, সব একে-একে কোথায় মিলাইয়া গেল; সমস্ত জগৎ খুঁজিলেও

কাহাকেও পাইবার উপায় নাই। মাতা নাই, পিতা নাই, ভাই নাই, ভগিনী নাই, সংসারে দাঁড়াইবার এক স্থান ছিল সুরেন্দ্র, সেও আজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সহসা রঙ্গিনীর মুখ তাঁহার মনে পড়িল। এতক্ষণ তিনি কোন মতে এই দারুণ দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু রঙ্গিনীর কথা মনে পড়িতেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সেই শ্মশান-ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলেন "সুরেন ভাই! তুমি গেলে, আর একজনকে মারিয়া গেলে কেন? এ জগতে রঙ্গিনীর যে সব ফুরাইল; বালিকা বয়সে সে যে দুঃখের অকূল সাগরে ঝাঁপ দিল। সুরেন্! এ কথা একবার ভাবিলে না—দুঃখিনীর দীর্ঘ জীবন কেমন করিয়া কাটিবে?"

এমনি করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যখন দিন শেষ হইয়া আসিল, তখন তিনি ধীরে-ধীরে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন; দেখেন, কোথায়ও কেহ নাই। তাঁহার আর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল না; আর রঙ্গিনীর সে মলিন মুখ দেখিতে সাহস হইল না; জননীর এবং তারকের সে আর্ত্তনাদ শুনিতে ভরসা হইল না। তিনি নিঃশব্দে স্কুলঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানা বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলেন।

[৯]

সুপ্রভার বেদনা অন্তর্যামীই জানিলেন। কিন্তু তাঁহারও বসিয়া-বসিয়া কাঁদিবার সময় নাই; এত বড় সংসার তাঁহার

মাথায়। তাই তিনি চোখ মুছিয়া আবার কাজে মন দিলেন। বড়বৌ রঙ্গিনীকে কাছে করিয়া বসিয়া রহিলেন। সুপ্রভা কাজ করিতে করিতে এক একবার শাশুড়ীর কাছে আসিয়া বসিতেছেন, আবার উঠিয়া যাইতেছেন। গৃহিণী একেবারে ধরাশায়ী হইয়া আছেন; সুপ্রভা তাঁহাকে কি বলিয়া যে সান্ত্বনা দিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। যখনই সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই চক্ষের জলে নিজের বুক ভাসিয়া গিয়াছে। আজ তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এমনি করিয়াই সংসারে বজ্রপাত হয়। সুরেন্দ্রকে তিনি নিজের পেটের সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন। গৃহিণীর কোলে এক একবার স্বর্ণকে দিতেছেন, কিন্তু গৃহিণীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বর্ণ তাঁহার কোল হইতে নামিয়া যাইতেছে। আজ আর সে খেলা করিতে যাইতেছে না, সে যেন কি বুঝিয়া কি ভাবিতেছে; মাঝে মাঝে এঘর ওঘর বেড়াইতেছে; যেন কাহারও অন্বেষণ করিতেছে।

প্রতিবেশিনী দুই চারিজন স্ত্রীলোক আসিয়া গৃহিণী এবং রঙ্গিনীকে স্নান করাইয়া আনিল। রঙ্গিনী এ জনমের মত সাড়ি ছাড়িয়া সাদা থানের ধুতি পরিধান করিল।

কিন্তু সময় ত কাহারও অপেক্ষা করে না, তাই দেখিতে দেখিতে বেলা গেল। মিত্রদিগের বাটীতে আজ কোন কাজ নাই। যিনি যেখানে বসিয়া ছিলেন, তিনি সেখানেই আছেন। কেবল স্বর্ণই ছুটাছুটী করিতেছে। এক একবার সুরেন্দ্রের শয়নঘরে যাইতেছে, এক একবার নীচে যাইতেছে, সে যেন

কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না; এক একবার উপরে আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "মা! কাকা?" কিন্তু কে তাহার এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? কি উত্তর দিবে? শেষে স্বর্ণ কান্না আরম্ভ করিল। সুপ্রভা অন্য উপায় না দেখিয়া একজন দাসী দ্বারা মহেন্দ্রকে সংবাদ দিলেন। মহেন্দ্র এতক্ষণ তারকের নিকট বসিয়া ছিলেন। সংবাদ পাইয়া ধীরে-ধীরে বাটীর মধ্যে আসিলেন। স্বর্ণ দৌড়াইয়া মহেন্দ্রের কোলে উঠিল; আবার ঐ প্রশ্ন "কাকা! কাকা?" এতক্ষণ পর্য্যন্ত মহেন্দ্র কোন মতে শোক সংবরণ করিয়াছিলেন; স্বর্ণের কথায় আবার তাহা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি কোন উত্তর না করিয়া তাহাকে লইয়া নীরবে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন গেল। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও সন্ধ্যা আসিল। ঘরে ঘরে প্রদীপ দেওয়া হইল। রঙ্গিনী কার্ত্তিকের স্ত্রীর নিকটে এতক্ষণ বসিয়া ছিল; যখন একটু রাত্রি হইল; তখন সে উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, যাহা যেমন ছিল তেমনই আছে; যেখানে যে দ্রব্য যেমন করিয়া সুরেন্দ্র রাখিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে আছে। বইগুলি টেবিলের উপরে যেমন করিয়া সাজানো ছিল, তেমনি আছে। রঙ্গিনী ধীরে-ধীরে টেবিলের নিকটে গিয়া একবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ের নিভৃত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিল। তারপরে সে নিঃশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

আজ তাহার কাঁদিবার বড় দরকার; হৃদয় খুলিয়া কাঁদিতে না পারিলে তাহার যে বুক ফাটিয়া যাইবে। হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল দেয়ালের গায়ে সুরেন্দ্র একটী পদ্য লিখিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, এবং নামের নীচে রঙ্গিনী একদিন নিজের নাম লিখিয়াছিল এবং লজ্জায় তৎক্ষণাৎ তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারই পাশে দেওয়ালে আর একস্থানে দুইটী লতা আঁকা। একদিন উভয়ে আড়াআড়ি দিয়া সেই দুইটী আঁকিয়াছিল; তাহাও চোখে পড়িল। তাহার পরে সে মেঝের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুপ্রভা রঙ্গিনীকে এ ঘরে প্রবেশ করিতে এবং দ্বার বন্ধ করিতে দেখিয়া প্রথমে মনে করিলেন, হয় ত রঙ্গিনী আত্মহত্যা করিবার জন্যই ঘরে গেল। কারণ স্বামীর বিয়োগে স্ত্রীলোক অতি অনায়াসেই এ কাজ করিয়া ফেলিতে পারে। তাই তিনি ধীরে-ধীরে পিছনে গিয়া দ্বার ঠেলিয়া জানিতে পারিলেন যে, দ্বার অর্গলবদ্ধ নহে। তখন তিনি সামান্য একটু-খানি খুলিয়া দ্বারের বাহিরে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। রঙ্গিনী দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতেছিল। সুপ্রভা এ সময়ে ঘরে প্রবেশ করা উচিত বোধ করিলেন না; তিনি বুঝিলেন যে রঙ্গিনীর প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবার বিশেষ দরকার। হঠাৎ রঙ্গিনী উঠিয়া টেবিলের কাছে গেল, এবং কালি-কলম লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একখানা চিঠির কাগজে কি কতকগুলা লিখিয়া সেখানা খামে বন্ধ করিয়াই

অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। এতক্ষণ সুপ্রভা বাহিরে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। রঙ্গিনীকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রঙ্গিনীকে কোলে করিয়া বসিলেন। অনেক যত্নে রঙ্গিনীর জ্ঞান হইল। রঙ্গিনী আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল এবং বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে সুপ্রভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, 'কি হোলো দিদি!' বলিয়া চীৎকার করিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া সুপ্রভার কোলের উপর পড়িয়া গেল।

[১০]

তার পরে যেমন করিয়া দুঃখের দিন কাটে, তেমনি করিয়া মিত্র-পরিবারেরও অনেক দিন কাটিয়া গেল।

সকলের দুঃখই ধীরে-ধীরে কমিতে লাগিল, শুধু একজন ক্রমেই গম্ভীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন, তিনি মহেন্দ্র। মহেন্দ্র কাহারও সঙ্গে বড় আলাপ করেন না; কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে "হুঁ" বলিয়াই সারিয়া দেন। তিনি তারকের সঙ্গে দিবারাত্রি আমোদ করিতেন, এখন তাঁহার সহিত বেশী কথা বলেন না। সকলেই মনে করে সুরেন্দ্রের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হইয়াই বুঝি মহেন্দ্র এমন হইতেছেন। কিন্তু একজন ভুল করিলেন না। তিনি সুপ্রভা। তিনি মহেন্দ্রের প্রতি অনুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মহেন্দ্র এখন মিত্রদিগের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া আর কোথাও

যাইতে চাহেন। যখন মহেন্দ্র একা বসিয়া চিন্তা করিতেন, তখনই সুপ্রভা অন্তরাল হইতে তাঁহাকে দেখিতেন। এক দিন তিনি সমস্ত কথা তারককে খুলিয়া বলিলেন। তারক শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন; পরে বলিলেন, "দেখি, আমি যদি কিছু করিতে পারি।" পরে এক সময়ে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া তিনি সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেন্দ্র কোন কথাই গোপন করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "তারক দাদা! আজ তোমার নিকট হৃদয় খুলিয়া বলি। সুরেন্দ্রের মৃত্যুতে তোমরা কাতর হইয়াছ, কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইতে পারি নাই। তোমার কনিষ্ঠ গিয়াছে; তুমি সেই দুঃখে কাঁদিয়াছ, কিন্তু তোমার সান্ত্বনার স্থল আছে। কিন্তু বল দেখি ভাই, জগতে আমার বলিতে কি আছে? যদি তোমার স্ত্রী না থাকিতেন, তাহা হইলে আমি সুরেন্দ্রের মৃত্যুর রাত্রেই দেশত্যাগ করিতাম। এ জগতে আজ আমার একমাত্র বন্ধন তোমার স্ত্রী। আর সুরেন্দ্রের হতভাগিনী স্ত্রীর কথা বলিব না, তাহাকে দেখিলে আমার গায়ের রক্ত শুকাইয়া যায়। আমি আর এ দেশে থাকিব না; তোমার নিকট আমি জীবনের জন্য ঋণী, কিন্তু দাদা! ক্ষমা করিও। যদি কোন দিন সুরেন্দ্রকে ভুলিতে পারি, তবে এ দেশে আসিব; কাঁদিও না! দুঃখিত হইও না। তোমার জন্য আমি দিবানিশি কাঁদিব; দাদা বলিয়া তোমাকে ভালবাসিব; কিন্তু সংসারে থাকিতে পারিলাম না।

এক ভয় তোমার স্ত্রী। আমি যাঁহাকে মায়ের মত মান্য করি, তাঁহার চক্ষের এক বিন্দু জলে আমার হৃদয় ভাসিয়া যাইবে। কি বলিব দাদা! তুমি দুঃখ করিও না। তোমার নিকট এইটী আমার ভিক্ষা।”

তারক বলিলেন—“মহেন্দ্র! তুমি আমার দুঃখ বুঝিলে না। আমার কনিষ্ঠের স্থান যে তুমি অধিকার করেছ, তা কি তুমি জান না? আমার স্ত্রী যে তোমাকে কত স্নেহ করে, তা কি তুমি বোঝ না? যাতে আমি কষ্ট পাই, আমার স্ত্রী কষ্ট পান, তা কি তোমার করা উচিত। দেখ! সুরেন্দ্রের কথা তোমাকে দেখিয়াই ভুলিতে চাই।

মহেন্দ্র। সব বুঝি; কিন্তু মন বোঝে না।

অনেক কথা হইল। তারক সমস্ত কথা সুপ্রভাকে বলিলেন। শুনিয়া সুপ্রভা বুঝিলেন কোন কাজ হয় নাই। তাঁহার স্বামী মহেন্দ্রকে ফিরাইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি মনে করিলেন, পরদিন সকালে নিজেই মহেন্দ্রকে কিছু বলিবেন; কিন্তু সেই রাত্রেই মহেন্দ্র গোপনে মনোহরপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রভাতে সকলে শুনিতে পাইল মহেন্দ্র না বলিয়া কোথায় গিয়াছে। তারক, সুপ্রভা এবং রঙ্গিনীর শোক আবার নূতন হইয়া উঠিল। কার্ত্তিক বড়ই দুঃখিত হইলেন, স্থানে স্থানে লোক পাঠাইলেন, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন; কিন্তু কোন সংবাদই আসিল না। তারকের একটী

আশা ছিল, শোকের বেগ কিছু কমিলেই মহেন্দ্র আবার আসিবেন। তিনি জানিতেন মহেন্দ্র তাঁহাকে ছাড়িয়া অধিক দিন কোথাও থাকিতে পারিবেন না।

[১১]

বিপদ একাকী আসে না। সুরেন্দ্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলেন; সুরেন্দ্রের শোকে মহেন্দ্র কাহাকেও কিছু না বলিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন; একটা সংবাদ পর্য্যন্তও দিলেন না। কার্ত্তিক ও তারক নানাদিকে অনুসন্ধান করিয়াও মহেন্দ্রের সংবাদ পাইলেন না। কিন্তু ইহাতেই বিপদ কাটিল না।

ফরিদপুর জেলায় মিত্রদিগের একটা জমিদারী ছিল। জমিদারী যে খুব বড় তাহা নহে, তবুও জমিদারী বটে। আদায় প্রায় বার হাজার টাকা। সেই জমিদারীতে একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। করিমগঞ্জের নায়েব মহাশয় পত্র লিখিলেন যে, পদ্মানদীতে যে একটা চর উঠিয়াছে, তাহার দখল লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার মল্লিক মহাশয়েরা সেই চর দখল করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন; এ সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে না পারিলে সে চরের দখল পাইতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে; স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে সুফল লাভ হইবে কি না, তাহা অনিশ্চিত। এ অবস্থায় যে প্রকারে হউক, চর দখল রাখিতে হইবে;

এবং তাহা করাই কর্ত্তব্য। কারণ, প্রজারা যদি বুঝিতে পারে যে এ পক্ষ হীনবল, তাহা হইলে তাহাদিগকে বশে রাখা বিষম কষ্টকর হইবে।

নায়েব মহাশয়ের পত্র পাইয়া কার্ত্তিক ও তারক বড়ই চিন্তিত হইলেন। তারক বলিলেন "আমার ত মনে হয়, ঐ চর লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া কিছুতেই উচিত নহে। এতই যখন গেল, তখন একটা চর গেলে আর কি হইবে?" কিন্তু কার্ত্তিক বিষয়কর্ম্মে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি বলিলেন "তা হ'লে ও জমিদারীর আশাই ত্যাগ করতে হয়। এখন কি আর দুর্ব্বলের কাল আছে? আজ যদি ঐ চরটা বেদখল হইয়া যায়, তাহা হইলে দু'দিন পরে দেখিবে, কোন একটা মহলও বেদখল হইয়া যাইবে; তাহার পর প্রজাদিগকে শাসনে রাখা শক্ত হইয়া পড়িবে।"

তারক বলিলেন "এখন ঐ চর দখল করিতে গেলে একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিশ্চয়ই হইবে। তাহা হইলেই ফৌজদারী বাধিয়া উঠিবে। টাকা খরচের জন্য ভাবিতেছি না, কিন্তু এ সময়ে এই রকম হাঙ্গামার মধ্যে যাওয়া কি ভাল হইবে?" কার্ত্তিক বিষয়ী লোক; তিনি বলিলেন, "তা বলিয়া আর উপায় কি? নায়েব মহাশয়কে পত্র লিখিয়া দিই, তিনি জোর করিয়া চর দখলে রাখিবার ব্যবস্থা করুন। আমিও একবার ঐ কাছারীতে যাই। ঘটনাস্থলের নিকটে উপস্থিত না থাকিলে নায়েব মহাশয় সব কাজ ঠিক-ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবেন না।"

তাঁহারা জমিদারী করিতে জানেন। নায়েব মহাশয় এবার এক হাত দেখাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

যথাসময়ে কার্ত্তিক পুরাতন ভৃত্য রাধানাথকে সঙ্গে লইয়া করিমগঞ্জের কাছারীতে পৌঁছিলেন। নায়েব মহাশয় তখন সালঙ্কারে মল্লিক জমিদারদিগের ঔদ্ধত্যের পরিচয় প্রদান করিলেন। মল্লিক জমিদারের লোকেরা যে মিত্রদিগের পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ করিয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়াছে, তাঁহাদের ক্ষমতাকে তুচ্ছ করিয়াছে, লাঠির চোটে তাঁহাদের সে অঞ্চল হইতে তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছে, বড় বাবু আসিলে তাঁহাকে সাতঘাটের জল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে, ইত্যাদি বহু কথা নায়েব, গোমস্তা, পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে বড় বাবুর কর্ণগোচর করিল। শুনিতে শুনিতে কার্ত্তিক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠি-লেন। কি, এত বড় কথা! মিত্র-গোষ্ঠীর অপমান, আমাকে সাতঘাটের জল খাওয়াইবে বলিয়া ভয়-প্রদর্শন! কুচ্ পরোয়া নেই, যা থাকে অদৃষ্টে! বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শপথ করিয়া ফেলিলেন যে, মল্লিক-জমিদারদিগের গর্ব্ব যদি খর্ব্ব করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি ফকিরচাঁদ মিত্রের ছেলে নহেন। বুড়া রাধানাথ অনেক নিষেধ করিল, কিন্তু কার্ত্তিক কাহারও কথা শুনিলেন না।

কর্ম্মচারীরা ত ইহাই চায়। তখন চারিদিক হইতে লাঠিয়াল সংগ্রহ হইতে লাগিল। টাকা পয়সার দিকে দৃষ্টি

নাই, যাহাতে চর দখল হয়, যাহাতে মল্লিক জমিদারদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারা যায়, তাহার জন্য কাত্তিক যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসিলেন। তারক এ সমস্ত সংবাদ কিছুই জানিতে পারিলেন না।

তাহার পর একদিন প্রাতঃকালে প্রায় পাঁচশত লাঠিয়াল লইয়া নায়েব মহাশয় চর দখল করিতে গেলেন। মল্লিক বাবুরাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; তাঁহারাও মিত্র বাবুদের গতি-বিধি, আয়োজন-উদ্যোগের সংবাদ লইতেছিলেন এবং গোপনে-গোপনে লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতেছিলেন।

মিত্র বাবুদিগের লাঠিয়ালগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অপর পক্ষেও যথেষ্ট লোক জমায়েত হইয়াছে। তখন আর ফিরিবার উপায় নাই। রাধানাথও লাঠিয়াল-দিগের সঙ্গে গিয়াছিল; সে নায়েবকে সেদিনের মত ফিরিতে বলিল; কিন্তু নায়েব মহাশয় সে কথা শুনিলেন না। তিনি তখন হুকুম দিলেন "চালাও লাঠি!"

আর কোথায় যাইবে! মিত্র বাবুদিগের লাঠিয়ালগণ তখন হুঙ্কার দিয়া বিপক্ষ দলকে আক্রমণ করিল। তাহারাও হটিল না। দুই দলে ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হইল। কেহই কম নহে; উভয়পক্ষেই বাছাবাছা লাঠিয়াল ছিল, বড় বড় খেলোয়াড় ছিল। দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষের পঁচিশ ত্রিশ জন লোক জখম হইয়া গেল। তবুও দাঙ্গা শেষ হয় না। অবশেষে রব উঠিল তিনটা খুন হইয়াছে, পুলিশ আসিতেছে। তখন উভয়

পক্ষই রণে ভঙ্গ দিল ; যে যেদিক্ দিয়া পারিল, পলায়ন করিল। জয়-পরাজয় অনিশ্চিত রহিল।

মিত্র বাবুদের নায়েব মহাশয় ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে কাছারীতে আসিয়া সমস্ত সংবাদ কার্ত্তিক বাবুর গোচর করিলেন এবং বাবুকে তৎক্ষণাৎ কাছারী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন। তিনি নিজেও সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কার্ত্তিক দেখিলেন বিষম বিপদ উপস্থিত। চর ত দখল হইলই না ; মধ্য হইতে প্রকাণ্ড একটা দাঙ্গা হইয়া গেল ; মল্লিক পক্ষের তিনটা খুন হইয়াছে বলিয়া ঘোষণাও পড়িয়া গেল। এ সময়ে তিনি যদি কাছারীতে থাকেন, তাহা হইলে পুলিশ আসিয়া প্রথমেই তাঁহাকে ধরিবে।

তখন তিনি নায়েব মহাশয়কে বলিলেন "নায়েব মহাশয়, আপনি এ সময়ে কাছারী ছাড়িয়া যাইবেন না। আমি এখনই রওনা হইতেছি। আপনার কোন ভয় নাই, যত টাকা লাগে আমি দিব, আপনাকে বাঁচাইবার জন্য যাহা চেষ্টা করিতে হয়, তাহা আমি করিব। আপনি সকলকে সাবধান করিয়া দিবেন, যেন আমি এখানে আসিয়াছিলাম এ কথা কেহ প্রকাশ না করে। আমি যদি আসামী শ্রেণীভুক্ত হইয়া চালান যাই, তাহা হইলে এ মোকদ্দমার তদ্বিরের বিঘ্ন হইবে। আপনি থাকুন, আমি চলিলাম। ফরিদপুরে এখনই মোক্তারের কাছে লোক পাঠান। যত টাকা খরচ হয় দিব, আমাদের স্বপক্ষে রিপোর্ট

করাইতেই হইবে। এ বিষয়ে আপনাকে আর বেশী কি বলিব?”

ঘাটে নৌকা প্রস্তুত ছিল। কার্ত্তিক রাধানাথকে সঙ্গে লইয়া সেই নৌকায় উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি পথের মধ্যেই নৌকা ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজে চলিলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটা রেল ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠিয়া তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে কাশীতে পৌছিলেন।

তাহার পর আর কি! এই চরের হাঙ্গামা ও খুন লইয়া তুমুল ব্যাপার আরম্ভ হইল। মনোহরপুরে সংবাদ পৌছিল। তারক দাঙ্গা ও খুনের সংবাদ পাইলেন, কিন্তু কার্ত্তিকের কোন সংবাদই পাইলেন না। নায়েবের পত্রে কার্ত্তিকের কোন প্রসঙ্গই নাই। যে সকল পত্র আসিতে লাগিল, তাহা সকলই কার্ত্তিকের নামে। তারক বুঝিতে পারিলেন যে, কার্ত্তিক ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া গা-ঢাকা দিয়াছেন।

তারক তখন যেখানে যত টাকা পাইলেন সংগ্রহ করিয়া লইয়া ফরিদপুরে যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। অজস্র অর্থব্যয় হইতে লাগিল। কার্ত্তিকের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। তিনি কাশী হইতে ফরিদপুরে আসিয়া জামিনে অব্যাহতি পাইলেন। বেআইনী জনতা, দাঙ্গা, জখম ও তিনটা খুনের অভিযোগ উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষই বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন।

তিনমাসকাল ফরিদপুরে মোকদ্দমা চলিল। অবশেষে আদালতের বিচারে উভয় পক্ষের নায়েবেরই দুই বৎসর কাল কারাবাসের আদেশ হইল; আরও পাঁচসাতজন কর্ম্মচারী কারাগারে গেল। ঘটনার সময় কাশীতে ছিলেন, এই মিথ্যা প্রমাণ উপস্থিত করিয়া এবং অন্যান্য অনেক যোগাড় করিয়া কার্ত্তিক অব্যাহতি লাভ করিলেন। নায়েব মহাশয়ের দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল; কিন্তু কোন ফলই হইল না।

এদিকে, যে চর উপলক্ষে এই খুন দাঙ্গা হাঙ্গামা অর্থ-ব্যয়, সে চর মল্লিক বাবুদের দখলে রহিয়াছে, ইহাই সাব্যস্ত হইয়া গেল। স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত করা ব্যতীত মিত্র বাবুদিগের উপায়ান্তর রহিল না। মোকদ্দমার গোলমাল মিটিয়া গেলে কার্ত্তিক ও তারক বাড়ীতে আসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন, ঘরে যে তের হাজার টাকা সঞ্চিত ছিল তাহা ত কোন্ দিক দিয়া উড়িয়া গিয়াছে, অধিকন্তু ত্রিশ হাজার টাকা ধার হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ তেতাল্লিশ হাজার টাকা এই মোকদ্দমায় ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সকলেই বলিল, মিত্র-পরিবার এ ধাক্কা সামলাইতে পারিবে না, এতদিনে বড়বাড়ীর পতন নিশ্চিত।

দশজনের এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলিতে যদিও অধিক বিলম্ব ঘটিল না, কিন্তু যে পথে মিত্রবাড়ীর এই অধঃপতনের ভবিষ্যদ্ বাণী করা হইয়াছিল, সে পথে অধঃপতন হইল না।

ভাগ্যলক্ষ্মী অন্য পথ অবলম্বন করিয়া বড়বাড়ী হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

[১২]

ফরিদপুরের মোকদ্দমার পর কার্ত্তিক যেন কেমন হইয়া গেলেন। তাঁহার সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল, তারক তাঁহার উপর বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার মনে এই প্রকার সন্দেহের উদয় হওয়া বিচিত্র নহে; কারণ, ফরিদপুরের চর লইয়া বিবাদের সূত্রপাত সময়ে তারক অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ না শুনিয়া, তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কার্ত্তিক এই বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চর ত দখলে আসিলই না; উপরন্তু এত দিনে তাঁহারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা ত গেলই, আরও ত্রিশ হাজার টাকার ঋণভার মস্তকে পড়িল। ইহার জন্য কার্ত্তিক যে অপরাধী, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তারক কোনও দিন এই কার্য্যের জন্য দাদার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। তবে কিছুদিন পূর্ব্বেই একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার উপর মোকদ্দমার বিপদ এবং বিপুল ঋণভার—ইহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। কেমন করিয়া এই ঋণ শোধ হইবে, সেই চিন্তাই তাঁহার প্রবল হইয়াছিল। এ সময়ে মহেন্দ্র যদি তাঁহার নিকটে থাকিত, তাহা হইলেও তাঁহার হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি আসিত; কিন্তু

তাঁহাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, এই গোলযোগ আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বেই মহেন্দ্র নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু কার্ত্তিক অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ হইয়াও তারকের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। কার্ত্তিক বিষয়ী লোক, তিনি বিষয়কর্ম্ম, টাকাকড়ি বুঝিতেন। তিনি মনে করিলেন, তাঁহারই বিবেচনার দোষে এই মোকদ্দমা হইল—এতগুলি অর্থ ব্যয় হইল—এত কষ্ট সহ্য করিতে হইল—এবং ত্রিশ হাজার টাকা ঋণভার মস্তকে গ্রহণ করিতে হইল। অথচ, চরও দখলে আসিল না। ইহার জন্য তাঁহার সর্ব্বদাই মনে হইত, তারক নিশ্চয়ই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছে, এবং সেই কারণেই তিনি বিমর্ষ হইয়া থাকেন, এবং কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা বলেন না।

কথাটা যদি স্পষ্টাস্পষ্টি হইত, তাহা হইলে কোন গোলই হয় না। কিন্তু যখন দুঃসময় উপস্থিত হয়, তখন এমন করিয়াই সব দিক্ গোল হইয়া যায়। মিত্র পরিবারেও ঘোর অশান্তির ছায়াপাত হইল।

এতকালের মধ্যে বিষয়-আশয় বা কাজকর্ম্মের সম্বন্ধে কোন পরামর্শের জন্য কার্ত্তিক বা তারক গ্রামের কাহাকেও ডাকিতেন না; দুই ভাইয়ে পরামর্শ করিয়াই কর্ত্তব্য অবধারণ করিতেন। কিন্তু কি কুক্ষণেই চর লইয়া মোকদ্দমা বাধিল, কি কুক্ষণেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইল; সেই সূত্রেই বাড়ীতে অলক্ষ্মী প্রবেশলাভ করিলেন। কার্ত্তিক এখন আর কোন কথা তারককে

জিজ্ঞাসা করেন না; যাহাতে তারকের সহিত বেশী সাক্ষাৎ না হয়, সেই ভাবেই চলাফেরা করেন। তারক কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার দাদার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তিনি ভালমানুষ;—তাই ভালমানুষের মতই ভাবিলেন, মামলা হারিয়া এবং ঋণজালে জড়িত হইয়াই তাঁহার দাদা এত বিষণ্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বাড়ীর মেয়েরা অনেকেই সেই কথাই ভাবিল। কিন্তু সুপ্রভা একটু বেশী বুঝিলেন। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার বড়ঠাকুর দেনার চিন্তায় কাতর নহেন; তাঁহার মনে অন্য ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে।

একদিন তিনি তারককে বলিলেন "দেখ, বড়ঠাকুর যেন দিনে-দিনে কেমন হইয়া যাইতেছেন। মুখে আগের মত হাসি নাই, কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলেন না; সর্ব্বদাই কি যেন ভাবেন। তুমি কি কিছু বুঝিতে পারিতেছ না?"

তারক বলিলেন "তা কি আমি বুঝিতে পারি নাই! এত টাকা ধার আমাদের মাথার উপর চেপে পড়েছে; দাদা সেই চিন্তাতেই কাতর হয়েছেন।"

সুপ্রভা বলিলেন "আমার কিন্তু তা মনে হয় না; তাঁর সে ভাবই নয়। আমি এতকাল তোমাদের সংসারে আছি, আমি তোমাদের সকলেরই মনের ভাব বুঝিতে পারি। তুমি যাই বল, আমার কিন্তু বড় ভয় হইয়াছে।"

তারক বলিলেন "না, না, ভয়ের ত কোন কারণই দেখ্‌ছি নে। আমার দাদা ত তেমন ভাই নন। তাঁর মনে কিছু হ'লে তখনই আমাকে বল্‌তেন।"

সুপ্রভা বলিলেন "দেখ, তোমাকে একটা কথা বলি। এই ত এতকাল দেখে আস্‌ছি; তুমিই হও আর বড়ঠাকুরই হন, তোমরা কেউ কোন দিন ত মাধব ঠাকুরের সঙ্গে কোন পরামর্শ করিয়া কাজ কর নাই।"

তারক বলিলেন "মাধব ঠাকুর! আমি যে তাকে যমের মত ভয় করি। তার অসাধ্য কাজ নাই। অত বড় ভয়ানক লোক আমাদের এ অঞ্চলে নাই। তার সঙ্গে পরামর্শ! কৈ, আমি ত এক দিনও মাধব ঠাকুরকে ডাকি নাই; তার বাড়ীতেও কোন দিন যাই নাই। তার সঙ্গে কে পরামর্শ করে?"

সুপ্রভা বলিলেন "কেন, এখন ত প্রায়ই বড়ঠাকুর তাকে ডেকে আনেন; ঘরের দুয়ার বন্ধ করে অনেকক্ষণ দুই-জনে থাকেন। তাই দেখেই ত আমার ভয় হয়েছে।"

তারক এই কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ নীরবে কি ভাবিলেন। তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সুপ্রভা, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে। মাধব ঠাকুর,—সে যে সর্ব্বনেশে লোক। তার সঙ্গে দাদা এমন কি পরামর্শ করেন? আমি যে কিছুই ভেবে ঠাহর করতে পারছি নে।"

সুপ্রভা বলিলেন "তা কি ক'রে বলব বল। তুমি বড় ঠাকুরকে কি কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পার না? না—তাই

বা কি ক'রে হয়? বড়ঠাকুর হয় ত তা হ'লে কি মনে করবেন।"

তারক বলিলেন "দাদাকে কোন কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারব না। তবে আমার এক সাহস আছে যে, দাদার কাছে মাধব ঠাকুরই হন, আর যিনিই হন, কারো চালাকী খাটাবার যো নেই। দাদা কারো পরামর্শে ভুলবার মানুষ নন। আর মাধব ঠাকুরই বা কি পরামর্শ দাদাকে দিতে পারে? যাক্, ও কথা আর ভেবে কাজ নেই। দাদার উপর আমার যে দিন অবিশ্বাস হবে, সে দিন যে আমি মরে যাব, সে দিন যে দেবতার উপরও আমার বিশ্বাস থাক্‌বে না।"

সুপ্রভা বলিলেন "ভগবান্ করুন, তাই যেন হয়। তবে মাধব ঠাকুর লোকটা ভারি বদ্, সেই যা ভাবনা।"

তারক বলিলেন "উপরে ভগবান্ আছেন, আর নীচে আছেন দাদা! তাঁদের ভাবনা তাঁরাই ভাববেন। আমি আর ভেবে কি করব।"

এইস্থানে মাধবঠাকুরের পরিচয়টা দিতে হইতেছে। মাধব ঠাকুরের বাস এই মনোহরপুর গ্রামেই। ঠাকুরের সামান্য দশ বার বিঘা ব্রহ্মোত্তর আছে; তাহাতে অতি অল্পই আয় হয়। সে আয়ে তাহার সংসার চলে না; সুতরাং সে নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই নানা উপায়ের মধ্যে সর্ব্ব

প্রধান উপায় পরের সর্ব্বনাশ-সাধন। সে অবশ্য কাহারও ঘরে সিঁদও দেয় না, ডাকাতিও করে না; কিন্তু সে যাহা করে, তাহা চুরী-ডাকাতির বাড়া। সে প্রকাণ্ড মামলাবাজ। লোকের মামলা মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া, শলা-পরামর্শ দিয়া, মহাশুভানুধ্যায়ী সাজিয়া, সে লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। কাহারও বাড়ীতে সামান্য একটু মনান্তর কি বিরোধের সন্ধান পাইলেই, সে, কোন না কোন পক্ষের পরম শুভানুধ্যায়ীভাবে উপস্থিত হয় এবং নিতান্ত আত্মীয়ের মত তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাকে পরামর্শ প্রদান করে এবং অবশেষে দুই পক্ষে গোলযোগ, মামলা বাধাইয়া নিজের উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া লয়। মনোহরপুর ও নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের ভাল লোকেরা তাহাকে হিংস্রজন্তু মনে করিয়া দূরে থাকে। আর যাহারা বিবাদ-বিসংবাদ, মামলা-মোকদ্দমা ভালবাসে, তাহারা মাধব ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন-কানুন মাধব ঠাকুরের একেবারে ওষ্ঠাগ্রে বর্ত্তমান। পাকা উকিল মোক্তার যে ব্যাপারে মত প্রকাশ করিতে, আইন নজীর দেখাইতে চিন্তা করিয়া থাকে, মাধব ঠাকুর কথা পড়িবামাত্র তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারে এবং অকাট্য আইন দেখাইয়া তাহার অনুগত পক্ষকে তখনই মোকদ্দমা জিতাইয়া দিয়া থাকে। তাহার পর আদালতে যাহা হইবার, তাহাই হয়। এই প্রকারে মাধব ঠাকুর বিলক্ষণ দুই পয়সা রোজগার

করিয়া থাকে। মহকুমা ও জেলার উকীল মোক্তার এবং কর্ম্মচারীরা সকলেই মাধব ঠাকুরকে জানে; জুনিয়ার উকিল মোক্তারেরা তাহাকে বিশেষ খাতির-যত্নও করিয়া থাকে।

মাধব ঠাকুর বহু চেষ্টা করিয়াও এতকাল মিত্র পরিবারের হিতৈষী হইতে পারে নাই; কার্ত্তিক ও তারক এই ভয়ানক জীবটীর ত্রিসীমাতেও যাইতেন না। মৌখিক যেটুকু সদ্ভাব রাখা প্রয়োজন, তাঁহারা তাহাই করিতেন। নিজেদের বিষয়-কর্ম্মের পরামর্শের জন্য তাঁহারা কোনদিনই তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারী কর মহাশয় ব্যতীত অপর কাহারও মুখাপেক্ষী হইতেন না।

ফরিদপুরের চর লইয়া যখন বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইল, তখন মাধব ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দুই তিনদিন মিত্র-বাড়ীতে আসিয়াছিল এবং মামলা সম্বন্ধে দুই চারিটী হিতো-পদেশও তারককে দিতে গিয়াছিল; কিন্তু তারক ঠাকুরের কথায় মনোযোগ না দেওয়ায় এবং তাহার সহিত কোন বিষয়ে পরামর্শ না করায় ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল।

চরের মোকদ্দমার শেষফল যখন মনোহরপুরের সকলেই জানিতে পারিল, তখন একদিন রামচন্দ্র রায়ের বৈঠকখানায় বসিয়া মাধব ঠাকুর রায় মহাশয়ের নিকট অনেক দুঃখ করিয়াছিল; বলিয়াছিল "হায় হায়, এতদিনে বড়বাড়ীর অধঃপতন হইল। আরে, মামলা-মোকদ্দমা করা কি কার্ত্তিক, তারকের কাজ! ওরা কতটুকুই বা বুদ্ধি রাখে। দেখদেখি,

প্রায় লাখটাকা খরচও হ'ল, অথচ পেঁয়াজ-পয়জার দুই-ই হ'ল। আমার উপর যদি ভার দিত, তবে দেখে নিতাম মল্লিক বাবুদের মাথার উপর কটা মাথা! বাবা, শুধু টাকা থাকলেই হয় না, শুধু দুপাতা বই পড়া বিদ্যে থাকলেই হয় না; মামলা করা সোজা কথা নয়। এই ত দেখ না, সেদিন ও-পাড়ার বিশ্বেসদের ভাইয়ে-ভাইয়ে মোকদ্দমা আরম্ভ হ'ল। নবীন বিশ্বেস এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল 'দাদাঠাকুর, তুমি যা হয় কর'। আমি কি করি, নবীন গ্রামের লোক, অনুগতও বটে। তিনমাস বাড়ী আর জেলা এক করে মামলা কেমন জিতিয়ে দিলাম। জান রায় ভায়া, জেলার হাকিমই বল, আর উকিল মোক্তারই বল, এই শর্ম্মার উপর কারও কথা বলা শক্ত। এই ত মতি সাহার দেওয়ানি মামলার যে আরজী আমি মুসুবিদে ক'রে দিয়েছিলাম, তাই নিয়ে ওরা ত হাইকোর্টের বড় বড় উকিলকে দেখিয়েছিল; কারও সাধ্য হোল না যে, তাতে 'এবং' কেটে 'ও' টা বসায়। আমি বলে দিয়েছিলাম, যাকে ইচ্ছে তাকে দেখিও, কারও এত বিদ্যে নেই যে মাধব শর্ম্মার মুসুবিদের উপর কলম চালায়। শুনবে তবে রায় ভায়া? এই তোমাদেরই সুবল রায় যখন কল্‌কাতায় তহবিল ভেঙ্গে ফৌজদারীতে পড়েছিল,—সে কথা মনে আছে ত? তখন ত তোমরাই ব'লে কয়ে আমাকে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দিলে। অতগুলো টাকা দিয়ে উকিল ব্যারিষ্টার রাখা হোলো। সাক্ষীর উপর কি জেরা করতে হবে, সেই নিয়ে যখন ব্যারিষ্টার সাহেবের

সঙ্গে উকিল বাবুদের ঘোর তক্‌রার, তখন আমি—এই মাধব শর্ম্মাই এমন তিন চারটে জেরা ব'লে দিলাম যে, অমন যে বাঘের মত ব্যারিষ্টার চক্রবর্ত্তি সাহেব—তিনি একেবারে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে আমার পিঠ থাবড়ে বল্লেন 'হাঁ, বুদ্ধি বটে!' জান রায় ভায়া, মামলার শলা-পরামর্শ এই আমাদের মত খেলোয়াড় লোকের কাছ থেকে নিতে হয়। কার্ত্তিক, তারক ত তা বুঝলো না। এখন মর, টাকাকে টাকাও গেল—চরও গেল—এখন ঘরে বসে কাঁদ। শুনেছ, ওদের প্রায় আট হাজার টাকা ধার হয়েছে। বার ভূতে টাকা লুঠে নিয়েছে। পড়ত আমার হাতে, দশ হাজার টাকার মধ্যে মোকদ্দমা জিতিয়ে দিতাম, মল্লিক বাবুরা আর মাথা তুল্‌তে পারত না। দুর্ব্বুদ্ধি, ভায়া, দুর্ব্বুদ্ধি!"

রামচন্দ্র রায় দুঃখিত স্বরে বলিলেন "তাই ত মাধব ভায়া, তুমি থাক্‌তে ছোঁড়া দুটো এমন ক'রে জেরবার হয়ে গেল, বড়ই কষ্টের কথা। এই মামলার পর থেকে কার্ত্তিক যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। অনেকগুলো টাকা ধার মাথায় পড়েছে, তার পর এই অপমানটা!"

মাধব ঠাকুর বলিল, "আরে ভায়া, আমাকে কি একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করলে যে, 'মাধব দাদা, কি করি?' তাহ'লে কি এমনটা হ'তে পারত। তবুও আমি আপনা হ'তে দুদিন তারকের কাছে গিয়েছিলাম। তারাই না বলুক, না ডাকুক, আমার ত একটা কর্ত্তব্য আছে। গ্রামের লোক ওরা, বিশেষ

লক্ষ্মী-শ্রী আছে, দশজনকে এতকাল পালনও করেছে। মনে করলাম নিজেই যাই। তা ভায়া, তোমায় বল্‌ব কি, তারকটা আমাকে আমলই দিলে না। তখন আর কি করি বল? এখন দেখুক, কত ধানে কত চা'ল।"

রায় মহাশয় বলিলেন "সে যাই হোক মাধব ভায়া, কার্ত্তি-ককে দেখে বড় কষ্ট হয়। আরও এক কথা; আমার যেন মনে হয়, এই মোকদ্দমা নিয়ে ভাই-ভাইতে একটু মনান্তর হয়েছে। শুনেছি, তারক না কি চর নিয়ে গোল করতে কার্ত্তিককে বারণ করেছিল। কার্ত্তিক সে কথা শোনে নাই। তাইতে তারক ভাইয়ের উপর নাকি ভারি বিরক্ত হয়েছে।"

মাধব ঠাকুর এই কথা শুনিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিল। সে তৎক্ষণাৎ রায় মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "তাই না কি? এ কথা ত আমাকে বল নাই। এ ত তারকের ভারি অন্যায়। মামলা মোকদ্দমা করতে গেলে হার-জিত হয়েই থাকে; তাই বলে কি এ রকম করতে হয়। বিশেষ বড় ভাই, পিতৃতুল্য; সে যদি একটা কাজ করেই থাকে, তার জন্য দশকথা শোনান কেন? জমিদারী করতে গেলেই মামলা-মোকদ্দমা করতে হয়। তাই ত ভায়া, এত-দিনের বনেদি ঘরটা তা হলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বড়বাড়ীর নাম দেখছি আর থাকে না।"

রায় মহাশয় বলিলেন "কি হয়েছে না হয়েছে, তা জানি

নে; তবে আমার এই রকমই বোধ হয়; আমি ওদের ভাব-গতিকে—”

মাধব ঠাকুর রায় মহাশয়কে কথা বলিতে না দিয়া বলিয়া উঠিল, “আরে ভাব গতিক কি বল্‌ছ—ও সব ঠিক কথা। আমি কি আর তা বুঝিনি। তবে কি জান, আমি একটু চাপা লোক; সব কথা সব সময় খুলে বলিনে, এই যা। আর কাজ কি আমাদের ও সব কথায়; তাই মনে করে চুপ করেই ছিলাম। তা, এখন যখন দশজনেই কথাটা জেনে ফেলেছে, তখন আর চুপ করেই বা কি করব। তারকের এ ভারি অন্যায়, কি বল ভায়া?”

রায় মহাশয় বলিলেন, “কৈ, তারক ত কাউকে কিছু বলে নি।”

মাধব ঠাকুর বলিল “আর লুকোচ্ছো কেন ভায়া? আমি মাধব শর্ম্মা, কথা পড়লেই বুঝতে পারি; যাক্‌, এ গোল-মালের একটা নিষ্পত্তি করাই দরকার। এত বড় বাড়ীটা যে ঝগড়া-বিবাদে উচ্ছন্ন যায়, এ আর আমরা দাঁড়িয়ে কেমন করে সহ্য করি বল! যাই, সন্ধ্যা হয়ে এল, বাড়ীতে যাই; সন্ধ্যা-আহ্নিক করিগে। দুর্গা দুর্গতিনাশিনী মাগো!”

মাধব ঠাকুরের সন্ধ্যা আহ্নিক মিথ্যা কথা! অন্য দিন অর্থাৎ যে দিন হাতে কাজকর্ম্ম না থাকে, সে দিন লোকদেখান সন্ধ্যা-আহ্নিক ব্রাহ্মণের ছেলে করিয়া থাকে; কিন্তু আজ কি আর সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় আছে! আজ যে সে খুব

বড় একটা শিকারের সন্ধান পাইয়াছে। আর কি তাহার বিলম্ব সয়?

রায় মহাশয়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই মাধব ঠাকুর ধীরে ধীরে বড়বাড়ীর দিকে গেল। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হইয়া আসে নাই। মাধব বড়বাড়ীর কাছারীপ্রাঙ্গণের সম্মুখে যাইয়া দেখিতে পাইল, কার্ত্তিক একাকী প্রাঙ্গণে পদচারণা করিতেছে। মাধব পায়ে পায়ে প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে দেখিয়া কার্ত্তিক দাঁড়াইলেন এবং দূর হইতেই ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। মাধব আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, মনে করলাম তোমরা কে কেমন আছ, খোঁজটা নিজে যাই। তা বাড়ীর সব মঙ্গল ত?

কার্ত্তিক ধীরস্বরে বলিলেন "তোমাদের আশীর্ব্বাদে বাড়ীর সকলেই এক রকম ভালই আছে।"

মাধব বলিল "কিন্তু তোমার চেহারা ত বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছে, কার্ত্তিক! মুখ-চোখ যে একেবারে ব'সে গিয়েছে। কোন অসুখ ত হয় নাই?"

কার্ত্তিক বলিলেন "না, শরীরে ত কোন অসুখ নেই।"

মাধব বলিল "আরে, শরীরের অসুখই কি অসুখ ভাই! মনের অসুখই প্রধান অসুখ। এই এত বড় সংসারটা মাথায় করে রয়েছ, তারপর এমন একটা ভয়ানক মোকদ্দমা হয়ে গেল; এতে মনের আর অপরাধ কি? তা, সর্ব্বদা এমন করে ভাবলে

ত কোন ফল নেই; যাতে মনটা ভাল হয়, তাই করতে হয়। তুমি যদি অমন হয়ে যাও ভাই, তা হলে এত বড় সংসারটা যে ভেসে যাবে, বড়বাড়ীর নাম-ডাক ত কম নয়।”

কার্ত্তিক কাতর-বচনে বলিলেন “আর দাদা, নাম-ডাক। সংসারে আর সুখ নেই; এখন যেতে পারলেই বাঁচি।”

মাধব বলিল “সে কি কথা কার্ত্তিক, তুমি সেদিনকার ছেলে; তুমি যদি অমন কথা বল, তা হ'লে আমরা ত নেই। তুমি অমন হ'য়ো না। ঘর পেতে গৃহস্থালী করতে গেলে অনেক সইতে হয়। কে কোথায় কি বল্‌ল, তাই কি মনে রাখতে হয়; আর তাতেই কি মন খারাপ করতে হয়।”

কার্ত্তিক বলিলেন “না, কারো কথা ত আমি ভাবিনে। মামলায় হার হয়েছে, তার কি করবো বল? যা হবার হয়ে গিয়েছে; তা নিয়ে যদি গ্রামের দশজন দশ কথা বলে, তাতে কি আর মন খারাপ করা চলে?”

মাধব বলিল “সে ত ঠিক কথা, তবে কি জান ভাই! আমরা দুর্ব্বল মানুষ; আমাদের মন একটুতেই যেন কেমন হয়। লোকের কথা ধরিনে, কিন্তু যদি নিজের জনেরাই কু-কথা বলে তা বড়ই প্রাণে বাজে।” এই বলিয়াই মাধব চুপ করিল।

কার্ত্তিক বলিলেন “তোমার কথা ত আমি বুঝতে পারলাম না, মাধব দাদা!”

মাধব বলিল "না, না, বিশেষ কিছু নয়, ঐ একটা কথার কথা বল্‌লাম।"

কার্ত্তিক কিছুদিন হইতেই এই কথাটা ভাবিতেছিলেন; সুতরাং মাধব ঠাকুরের সামান্য ইঙ্গিতেই তিনি কথাটা বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহার জানিবার আগ্রহ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। মাধব ঠাকুরকে কথাটা ঢাকা দিতে দেখিয়া তিনি বিশেষ আগ্রহভরে বলিলেন "না মাধব দাদা, তোমার ওটা কথার কথা ব'লে বোধ হচ্চে না। আসল কথাটা কি, খুলে বল না। তোমাকে বল্‌ছি, এ কথা আমি কারো কাছে প্রকাশ করব না।"

মাধব বলিল "না, সে এমন কিছু কথা নয়। সে কথা শুনেই বা তোমার লাভ কি হবে, সুধু মনে আরও কষ্ট হওয়া বই ত নয়।"

কার্ত্তিকের আগ্রহ আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "না, মাধব দাদা, কথাটা তোমাকে খুলে বল্‌তেই হচ্চে। তা, এখানে দাঁড়িয়ে কাজ নেই; চল, বাগানের মধ্যে গিয়ে বসি।" এই বলিয়া তিনি মাধব ঠাকুরের হাত চাপিয়া ধরিলেন। মাধব তখন নিতান্ত অনিচ্ছার ভাব দেখাইয়া কার্ত্তিকের সঙ্গে বাগানের মধ্যে গেল; এবং একটা নির্জ্জন স্থানে একখানি বেঞ্চ টানিয়া লইয়া দুইজনে উপবেশন করিলেন।

তখন কার্ত্তিক পুনরায় মাধবের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলি-

লেন "মাধব দাদা, আমাকে সব কথা খুলে বল। কিছু গোপন করো না।"

মাধব ঠাকুর বলিল "তাই ত ভায়া, তুমি আমাকে বড়ই বিপদে ফেললে দেখ্‌চি। তুমিও আমার কাছে যেমন, তারকও তেমনই। কিন্তু কি করব ভাই, তুমি যখন ছাড়ছ না, তখন মিথ্যা কথা আর কেমন করে বলি। তারক যে তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে, এ আমি আগেই জান্‌তে পেরেছিলাম; কিন্তু সে কথা ত আর যার-তার কাছে বলা যায় না। আমি তখনই বুঝেছিলাম যে, এই মোকদ্দমায় তোমাদের হার হবে। কিন্তু আমার ত কোন হাত ছিল না; আমার যা কর্ত্তব্য, তা আমি করেছিলাম।"

কার্ত্তিক বলিলেন "সে কি রকম; আমি ত কিছুই জানিনে; এখনও কিছু বুঝতে পারছি নে।"

মাধব বলিল "তুমি সোজা মানুষ ভাই,—একেবারে মহাদেব; তোমার কি এ সব ফন্দী মনে আসে, না তুমি তা করতে পার। তবে কথাটা খুলেই বলি। এই তোমাদের ফরিদপুরের দাঙ্গার খবর যখন বাড়ীতে পৌঁছিল, তখন গ্রামের সকলেই কথাটা শুন্‌তে পেলেন; কিন্তু কেউ কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। আমি ত আর চুপ করে থাক্‌তে পারি নে; স্বর্গীয় কর্ত্তাদের অনেক খেয়েছি, অনেক উপকার তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি। তাই খবর পাওয়া মাত্রই তাড়াতাড়ি এসে তারকের সঙ্গে দেখা করলাম। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলাম।

আর জান ত ভাই, এ অঞ্চলে সকলেই জানে যে, মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির আমি যেমন করতে পারি, এমন বড় বড় উকিলেও পারে না। আমি তারককে বল্‌লাম যে, আমি ফরিদপুরে যাই, তিন তুড়ি দিয়ে মামলা ফাঁসিয়ে দিয়ে হাসতে-হাস্‌তে তোমাকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসি। তারক তাতে যা বল্‌লে, তা শুনে ত আমি অবাক্ হয়ে গেলাম,—একেবারে ভাই, মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লাম। সে বল্‌ল কি, 'যান মশাই, আপনাকে আর পরামর্শ দিতে হবে না। আমি ত দাদাকে এ সব করতে বারণই করেছিলাম। আমার কথা না শুনে যেমন কাণ্ড করে বস্‌লেন, তার ফলভোগ করুন। আমি এক পয়সাও খরচ করতে পারব না, মরুন গে তিনি জেলে পচে।' এমন কথা কি ভাই ভাইকে বল্‌তে পারে? শেষে আমি অনেক বুঝিয়ে বলায় তবে সে নিতান্তই অনিচ্ছা ক্রমেই ফরিদপুর গেল। মামলার তেমন তদ্বির হ'লে কি আর এমন হয়। আর যে শুন্‌ছো, লাখ্ টাকা খরচ হয়ে গেল, ও সব বাজে কথা। ভারি একটা দাঙ্গা, তারই জন্য কি না লাখ টাকা খরচ। আমি তোমায় বল্‌ছি কার্ত্তিক, এই মামলায় খুব যদি খরচ হয়ে থাকে, তবে আট দশ হাজার টাকা—তার একটা কড়িও বেশী নয়। ঐ করতে-করতে আমার চুল পেকে গেল, আমি কি আর বুঝিনে। তারপর শোন ভাই, এখন গ্রামের মধ্যে শুধু তোমার নিন্দে করে বেড়ান হচ্ছে। শুন্‌ছি না কি, কি একটা পরামর্শ গোপনে হচ্ছে। তাই মনে করলাম, তারকই না হয়

আমাকে অপমান করেছিল, তাই বলে ত আর তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ লোপ হয় নাই। মনে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল। যাক্ তোমাকে সব কথা খুলে বলা আমার কর্ত্তব্য, তাই ব'লে গেলাম। শেষে তুমিই হয় ত বল্‌তে 'মাধব দাদা, এত জেনে-শুনেও তুমি আমাকে কিছু বলনি।' আমার কাজ আমি করে গেলাম। এখন তা হ'লে আসি ভাই!" এই বলিয়াই মাধব ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইল; কার্ত্তিকও উঠিয়া বলিলেন "দেখ মাধব দাদা, এর একটা বিহিত করতে হবে। আমি সবই বুঝতে পেরেছি। যাক্, যা হবার তা হ'য়ে গিয়েছে; ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়া দরকার। কি বল?"

মাধব বলিল "সে ভাই, তুমি বোঝ। আমি আর তোমাকে কি উপদেশ দেব।"

কার্ত্তিক মাধবের হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "না মাধব দাদা, তুমি আমাকে অমন করে ঝেড়ে ফেল্‌লে আমি কোথায় দাঁড়াই। দেখ, আজ রাত হয়ে গেল, আজ আর তোমাকে আট্‌কাব না। তুমি কাল খেয়ে-দেয়ে দুপুর বেলায় একবার দয়া করে এস ভাই! এর একটা বিহিত করতেই হবে। তোমাকেই সে সব ব্যবস্থা করতে হবে।"

মাধব বলিল "আমাকে আর এ গোলের মধ্যে জড়াও কেন ভাই! বুঝে-সুঝে যা হয় নিজে কোরো।"

কার্ত্তিক নিতান্ত বিপন্নের ন্যায় কাতরবচনে বলিলেন

"না দাদা, এ বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করতেই হবে। তুমিই এখন আমার একমাত্র সম্বল।"

মাধব অনেক আপত্তি করিয়া অবশেষে সম্মত হইল। তাহার পর দুই তিন দিন কার্ত্তিকের বসিবার ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া দুইজনে নানা পরামর্শ হইতে লাগিল। সে পরামর্শের মধ্যে যখন আমরা ছিলাম না, তখন তাহার বিশেষ বিবরণ কেমন করিয়া দিব।

[১৫]

সুপ্রভা যদিও তারককে এই আসন্ন বিপদের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তারক সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাঁহার দাদা—যিনি তাঁহাকে এত স্নেহ করেন—যিনি তাঁহার একমাত্র অবলম্বন—একমাত্র আশ্রয়,—সেই দাদা তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু করিবেন? না—এমন সংশয় মনে স্থান দিলেও অপরাধ হয়। ও সব কিছুই নয়। কিন্তু—। ঐ 'কিন্তু'তেই ত সকল গোল করিয়া দিতেছিল—সকল সংশয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছিল। কিন্তু—মাধব ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার দাদা গোপনে কি পরামর্শ করেন? মাধব ঠাকুরের রীতিপ্রকৃতি সকলই ত তিনি জানিতেন; তাঁহার দাদাও যে না জানেন, তাহাও ত নহে। তবে কি পরামর্শ? এমন কি পরামর্শ, যাহা তাঁহার সঙ্গে না করিয়া, গ্রামের মধ্যে অনর্থ বাধাইবার যে গুরুঠাকুর, সেই

মাধব ঠাকুরের সঙ্গে হয় ? তারক একবার মনে করিলেন, দাদাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু দাদার মনে যদি কোন গোল না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার মনে যে ভয়ানক কষ্ট দেওয়া হইবে, তাঁহার প্রাণে যে গভীর আঘাত লাগিবে ! না, তারক দাদাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না। কিন্তু—। আবার সেই কিন্তু ! কিন্তু, দাদা যে তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথাই বলেন না ; ভাল করিয়া কেন, আজ তিন চারি দিন যে তিনি মোটেই তারককে ডাকিয়া একটী কথাও বলেন না ; দেখা হইলে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান। সর্ব্বদাই তিনি অতি গভীরভাবে কি চিন্তায় নিমগ্ন। দাদার কিসের এত চিন্তা ? ত্রিশ হাজার টাকা ধার হইয়াছে, তাহার জন্য কি দাদা বিমর্ষ ? তাতে কি হইয়াছে ? একটা চরই না হয় গিয়াছে, আরও ত জমিদারী আছে, কারবার আছে। ভয় কি ? ত্রিশ হাজার টাকা শোধ হইতে কয়দিন লাগিবে ? দুই ভাই যদি বেশ ভাল করিয়া দেখাশুনা করেন, চারিদিকের ব্যয় সঙ্কোচ করেন, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে টাকা শোধ হইয়া যাইবে। না -তাঁহার দাদা এই সামান্য ঋণের জন্য এত বিষণ্ণ হন নাই—এত কাতর হন নাই। তবে কি ? তারক বহু চিন্তা করিয়াও এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাইলেন না। শেষে মনে স্থির করিলেন, "না—আমি আর এ সকল চিন্তা মনে স্থান দিব না। ইহাতে পাপ হয়, ইহাতে আমার দাদার উপর অবিচার করা হয়। দাদা যাহা করিবেন,

তাহা যেমন এতদিন মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়াছি, সে কয় দিন বাঁচিয়া থাকিব, সে কয়দিন তাহাই করিব। মাথার উপর জগদীশ্বর, আর সম্মুখে আমার দাদা! আমি যেন এই বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারি।"

কিন্তু, আর বেশী দিন তারককে অন্ধকারে থাকিতে হইল না। ইহারই মধ্যে একদিন মাধব ঠাকুর তারককে ডাকিয়া বলিল "ভাই তারক, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে?"

তারক বলিলেন "আজ্ঞা করুন।" তখন মাধব ঠাকুর বলিলেন—"দেখ ভাই, তুমিও যেমন আমার আপনার জন, কার্ত্তিকও তাই। তুমিও একটা কথা বল্‌লে, আমি ফেল্‌তে পারি নে, কার্ত্তিকও কিছু বল্‌লে তা আমাকে শুন্‌তে হয়। তোমরা দুই-ই আমার কাছে সমান।"

তারক বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বুক কাঁপিতে লাগিল; এ কি অশনিপাতের পূর্ব্ব সূচনা! তারক ধীর ভাবে বলিলেন "মাধব দাদা, কথাটা কি, আমাকে দয়া করে বলে ফেলুন না। আপনি অত সঙ্কুচিত হচ্চেন কেন?"

মাধব বলিল "তা—কথাটা কি জান ভাই! এই কার্ত্তিক— তুমি ত জান আমি তোমাদের কোন কথার মধ্যেই থাকিনে। আর থাকবই বা কেন, তোমরা দুই ভাই এখন যোগ্য হয়েছ, সবাই দেখে শুনে বুঝে নিলেই করতে পার। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পরামর্শের দরকারই বা কি আছে? তবে জান কি—

এই কার্ত্তিক আজ কয়দিন আমার বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি করছে। আমি কত ক'রে বল্‌লাম যে 'ভাই, ও সবের মধ্যে আমাকে জড়িয়ো না, তোমরা ভাই-ভাইয়ে যা হয় কর।' কিন্তু সে তা কিছুতেই শুন্‌বে না,—আমার পায়ের উপর একেবারে আড় হ'য়ে পড়ল। তাই কি করি বল—তাই তোমার কাছে আস্‌তে হোলো, নইলে তুমি ত জান ভাই, আমি ইচ্ছা ক'রে কোন গোলযোগের মধ্যে যেতে চাইনে।"

তারক একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন; তিনি বলিলেন "মাধব দাদা, আপনার পায়ে পড়ি, আর আমাকে কষ্ট দেবেন না, কথাটা কি বলে ফেলুন।"

মাধব বলিল "কথাটা—তা এমন কিছু নয় ভাই! কার্ত্তিক আমাকে কয়দিন থেকেই বল্‌ছে যে, চরের মোকদ্দমায় যে সকল খরচপত্র হয়েছে, তার হিসাবটা আমি ভাল করে দেখি। কত কি হোলো, কিসে কি গেল, সেগুলো একবার দেখা দরকার। তাই—তাই আমাকে বল্‌ছিল। আমি কত করে বল্‌লাম যে 'তুমি নিজে দেখ্‌লেই পার', তাতে সে বলে 'আমি কি অত-শত বুঝি, তুমিই সেগুলো দেখ'। তাই তোমাকে বল্‌তে এলাম।"

তারক এই কথা শুনিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। এ কি বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত! তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠেন; কিন্তু কিসে যেন সে শক্তি অপহৃত হইয়া গেল।

তারককে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মাধব বলিল, "তা হলে কি বল ভাই ?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া তারক একবার মাধব ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পরই আত্মসংবরণ করিয়া অতি ধীর স্বরে বলিলেন "দাদার আদেশ আমি মাথা পাতিয়া লই-লাম। আপনি যখন হয়, তখনই কাগজপত্র দেখ্‌বেন, আমি গোমস্তাদিগকে বলিয়া দিব।"

মাধব বলিল "সে সময় তোমারও উপস্থিত থাকা দর-কার; তোমাকেও হয় ত দু-চার কথা জিজ্ঞাসা করতে হ'তে পারে।"

তারকের হৃদয়ের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল; তখনই তিনি একটা অতি শক্ত জবাব দিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু অসাধারণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তিনি বলিলেন "মাধব দাদা, সবই কাগজপত্রে আছে। আপনি আছেন, আর দাদা—" তারক আর কথা বলিতে পারিলেন না; ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

তারক মাধব ঠাকুরের নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন বটে, কিন্তু কোথায় যাইবেন, কাহার নিকট তাঁহার হৃদয়ের এই গভীর বেদনার কথা বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। একবার মনে করি-লেন, সুপ্রভাকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিয়া, তাঁহার নিকট বসিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার একটু লঘু করেন; আবার মনে

করিলেন, তাঁহাকে আর কষ্ট দিয়া কি হইবে? তারক অস্থির-ভাবে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক বেড়াইলেন। তাহার পর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাদের পুরাতন কর্ম্মচারী স্বরূপ করকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন চাকরকে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র কর তারকদের পিতার আমলের কর্ম্মচারী। সামান্য গোমস্তার পদে নিযুক্ত হইয়া এই ৪০ বৎসর এই সরকারেই কাজ করিতেছেন। এখন তিনি মিত্রদের সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী। এমন বিশ্বস্ত ও ধর্ম্মভীরু কর্ম্মচারী পাইয়াছিলেন বলিয়াই মিত্রদিগের এত উন্নতি। কার্ত্তিক ও তারক তাঁহাকে কাকা বলিয়া ডাকেন এবং বিশেষ সম্মান করেন; তিনিও দুই ভাইকে সন্তানের মত স্নেহ করেন। কিন্তু কি কুক্ষণেই এই চরের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল! কার্ত্তিক এই উপলক্ষে যে তারকের উপরই বিশ্বাস হারাইয়াছেন, তাহা নহে; এই পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকেও তিনি সন্দেহ করিয়াছেন। মাধব ঠাকুরও তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, কর মহাশয়ের সহিত যোগাযোগে তারক এই মোকদ্দমা উপলক্ষে, নিতান্ত কম হইলেও ত্রিশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। কার্ত্তিকও তাহাই বুঝিয়াছেন। লক্ষ্মী যখন ছাড়িয়া যান, তখন এই রকমেই বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দিয়া যান।

একটু পরেই স্বরূপ কর মহাশয় কাছারী বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু অন্য দিনের মত তারককে কাছারীতে না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভৃত্য বলিল, 'মেজ বাবু পূজা-

বাড়ীতে আছেন।' কর মহাশয় তখন পূজাবাড়ীতে যাইয়া দেখেন, তারক একাকী চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়িতে বিনা আসনে বসিয়া আছেন। কর মহাশয় তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন "কি বাবা, এখানে এমন ক'রে একলা মাটীতে বসে আছ কেন?"

তারক তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; স্ত্রীলোকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। কর মহাশয় তাড়াতাড়ি তাঁহাকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "কি হয়েছে বাবা, বাড়ীর মধ্যে সব ভাল ত? তুমি অমন করছ কেন? কি হয়েছে, আমাকে বল।"

তারকের কি তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল, তিনি কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক সান্ত্বনা দিবার পর তারক যখন একটু স্থির হইলেন, তখন তিনি একে-একে সমস্ত কথা কর মহাশয়কে বলিলেন; কর মহাশয়ও কোন প্রকার বাধা না দিয়া সব কথা শুনিয়া গেলেন। অবশেষে তারক বলিলেন—"কাকা, এখন কি কর্ত্তব্য, তাই স্থির করবার জন্য আপনাকে ডেকেছি। আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। আমি আপনার ছেলের মত; আপনি উপদেশ করুন। আমার দাদা —আমার দাদা"—বলিতে বলিতেই অধোমুখে নীরব হইলেন।

কর মহাশয় বিচক্ষণ লোক; তিনি সবই বুঝিতে পারিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "সব কথাই ত শুনলাম বাবা, এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করেছ?"

তারক বলিলেন "আমি কিছুই স্থির করতে না পেরেই ত আপনাকে ডেকেছি।"

কর মহাশয় বলিলেন "আমি যে কিছু না বুঝতে পেরে-ছিলাম, তা নয়; কিন্তু এতটা যে হবে, তা ভাবিনি। যাক্, তুমি যে এতদিন পর্য্যন্ত মাথা ঠিক রেখে কাজ করেছ, তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তবে কথা কি জান, এতদিনে তোমা-দের সর্ব্বনাশের সূচনা হ'ল। আজ চল্লিশ বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা করলাম, তা আর থাকে না; বড়বাড়ীর নাম দেখছি আর থাকে না। কি করব বল? নইলে বড় বাবুর কি এমন দুর্ব্বুদ্ধি হয়! আমার নিজের কথা ভাবি নে; আমি ত কালই সব বুঝিয়ে দিয়ে ইস্তফা দেব। কতদিন থেকে মনে করছিলাম, কাশীবাস করব; কিন্তু কেমন মায়া, কিছুতেই আর এ মায়া কাটাতে পারছিলাম না। বিশ্বেশ্বর এই উপলক্ষ করে আমার মায়া কাটিয়ে দিলেন। আর মান-অপমান—সে ভয় বাবা, আর এ বুড়ো বয়সে নেই। মানুষের কাছে জবাব-দিহির সময় আমার পার হয়ে গিয়েছে, এখন সেখানে গিয়ে আমি খুব মাথা উঁচু ক'রে জবাবদিহি করতে পারব, এ ভরসা আমার আছে। সে জন্য ভয় নেই; কিন্তু তোমার পক্ষে কি কর্ত্তব্য তাই আমি ভাবছি। তোমার মত দেবতুল্য মানুষের যে এমন মনের কষ্ট হবে, তা ত বাবা, আমি কোন দিন ভাবিনি। দেখ বাবা, সব বুঝে-সুঝে করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে বড় বাড়ীর নাম বজায় থাকে। আমি

তোমাকে এখনই কিছু বল্‌তে পারছি নে। বুড়ো মানুষ, একটু সময় দেও; আমি ভেবে দেখি, কোন উপায়ে সব দিক রক্ষা করা যায় কি না। তুমি ভীত হোয়ো না, তোমার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে আমি কাশী যাব। তুমি কার্ত্তিককে কিছু বোলো না; তার এখন যে রকম মনের অবস্থা, আর মাধব তাকে যে রকম পেয়ে বসেছে, তাতে তাকে এখন কিছু বলা না বলা সমান হবে। মনে বল বাঁধ বাবা, বিশ্বেশ্বর আছেন, তিনিই তোমার মঙ্গল করবেন। চল, তোমাকে বাড়ীর মধ্যে রেখে আমি বাড়ী যাই। ওঠ, আর দেরী কোরো না।"

তখন কর মহাশয় তারককে বাড়ীর মধ্যে পৌঁছাইয়া দিয়া, নিজে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

[১৬]

পরদিন কর মহাশয় কাছারীতে আসিয়াই দেখিলেন কার্ত্তিক ও মাধব ঠাকুর বসিয়া আছেন। তিনি কোন কথা না বলিয়া কাছারী ঘরের মধ্যে যাইতে উদ্যত হইলে কার্ত্তিক বলিলেন "কাকা, একটা কথা আছে।" কর মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন "কি কথা?" কার্ত্তিক বলিলেন "চরের মোকদ্দমার হিসাবটা একবার দেখ্‌তে চাই।" কর মহাশয় বলিলেন "সে হিসাব ত তুমি দেখেছ. মেজ বাবুও দেখেছেন; তিনি সই করেও দিয়েছেন।" কার্ত্তিক বলিলেন "তবুও একবার দেখ-বার দরকার হয়েছে।" কর মহাশয় বলিলেন "সে হিসাব ত

সেরেস্তায় আছে ; চাইলেই পেতে ! আচ্ছা, আমি ব'লে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি কাছারীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং একটু পরেই একজনের দ্বারা হিসাবটা বারান্দায় পাঠাইয়া দিলেন।

মাধব ঠাকুর তখন হিসাবটা হাতে করিয়া প'ড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে কর মহাশয় একখানি কাগজ হাতে করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং কাগজখানি কার্ত্তিকের হাতে দিয়া বলিলেন "বড় বাবু, আজ চল্লিশ বছর তোমাদের সংসারে কাটালাম ; এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আর কাজকর্ম্ম ক'রে উঠতে পারিনে। তাই কাশী যাওয়ার সঙ্কল্প করেছি। তোমরা এখন উপযুক্ত হয়েছ ; দেখে শুনে কাজ কর। এই আমার ইস্তাফা-পত্র।"

কার্ত্তিক পত্রখানি না পড়িয়াই বলিলেন "কেন কাকা, হঠাৎ আজ আপনি ইস্তাফা দিলেন ? আমি ত"—

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কর মহাশয় বলিলেন "হঠাৎ নয় বাবা, অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু তোমাদের মায়ায় যেতে পারিনি। সংসারে আর ত কোন বন্ধন নেই। একটা মেয়ে, তাকেও তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে সৎপাত্রেই দিয়েছি। এখন তোমরা ছেড়ে দেও, আমরা বুড়ো-বুড়ি কাশী গিয়ে শেষের কটা দিন কাটিয়ে দিই, আর তোমাদের মঙ্গল-কামনা করি।"

কার্ত্তিক কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায়

বাধা দিয়া মাধব ঠাকুর বলিল "তা এত তাড়াতাড়ি কেন যাবেন? আর যাবেন বল্লেই ত হয় না; সব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে।"

কর মহাশয় একটু অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন "মাধব, তোমার সঙ্গে ত আমি কথা বল্‌ছি নে। তুমি একটু চুপ করে শোন। দেখ বড়বাবু, আমি ত কাঁচা ছেলে নই; তোমরা যখন থেকে সাবালক হয়েছ, তখন থেকেই সব তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি। হাঁ, যখন কর্ত্তারা ছিলেন, তখন আমিই কাজ করতাম, সব ঝুঁকি আমার উপর ছিল। আজ ছয় বৎসর হোলো সবই ত তোমরা করছ। তোমাদের দস্তখতি মঞ্জুরি ভিন্ন কেউ কোন কাজ করতে পারবে না, এ হুকুমও আমি দিয়েছিলাম। একটী পয়সাও তুমি বা মেজবাবুর মঞ্জুরি ছাড়া কোথাও খরচ হবার পথ রাখিনি। মাধব, এ বুড়োকে গোলে ফেলবার চেষ্টা তোমার নিতান্তই বৃথা হবে। আমি এই দণ্ডে বেরিয়ে গেলেও কারো সাধ্য নেই যে, একটা কথা বলে। আজ চল্লিশ বছর এই ক'রে চুল পাকিয়েছি মাধব, তুমি ত কা'লকের ছেলে।"

মাধব ঠাকুর বলিল "না, না, আমি কি সে কথা বল্‌ছি? আমি বল্‌ছিলাম যে, সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ে যেতে হবে ত!"

কর মহাশয় বলিলেন "তুই ভাইকে সবই দেখিয়েছি, দেখাতে কিছুই বাকী নেই মাধব। ঐ ত বড়বাবু বসে

আছেন, আর ডাক মেজবাবুকে, তাঁরা যদি আরও কিছু দেখ্তে চায়, কোন একটা কিছুর নিকাশ চায়, তখন সে কথা হবে।"

কার্ত্তিক এতক্ষণ কথা বলে নাই, তিনি বলিলেন "না কাকা, সে কথাই নয়। আপনি বিরক্ত হবেন না। এই মামলার হিসাবে বড়ই বেশী খরচ হয়ে গিয়েছে কি না, তাই একবার দেখ্‌ছিলাম।"

কর মহাশয় বলিলেন "সে ত ভাল কথা, সবই ত দেখ্‌তেই হয়। ছেলেবেলা থেকে তোমাদের দুই ভাইকে তাই শিখিয়েছি।"

মাধব বলিল "এ হিসাবে দেখ্‌চি মেজবাবুর সই রয়েছে বড়বাবুর সই ত নেই?"

কর মহাশয় একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "মাধব, সব জেনে নিয়েছ, ঐটে বুঝি জান্‌তে পার নাই? তবে শোন আমাদের এই ফারমের পক্ষ হতে এঁরা দুইভায়ের যে কেহ স্বাক্ষর করলেই তা বলবৎ হয়; এই রকম একটা লেখাপড়া আছে। তাইতে যিনি যখন উপস্থিত থাকেন, তিনিই সই করলে ব্যাঙ্ক থেকে পর্য্যন্ত চেকের টাকা বাহির হয়ে আসে সে সম্বন্ধে পাকা দলিল আছে। বড় বাবুকেই জিজ্ঞাসা কর। যাক্, এতকাল যখন বিনা কৈফিয়তে কাজ ক'রে এসেছি, তখন এখন আর মাধব ঠাকুরের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে পারি না। ওরে, কে আছিস্, আমার চাদরখানা আর লাঠীগাছটা এনে দে ত; বাড়ী যাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন "কাকা, আপনি রাগ করে চলে যাচ্ছেন কেন? আপনাকে ত কেহ কিছু বলে নাই?"

কর মহাশয় বলিলেন "কে কি বল্‌তে পারে বাবা! সে রকম যদি স্বরূপ কর হোতো, তা হ'লে এই চল্লিশ বৎসরে তার বাড়ীতে কোঠা-বালাখানা হোতো, সে দশবিশ হাজার টাকার বিষয় করতে পারত। ভগবান্‌ সে মতি দেন নাই। তবে একজন আমাকে যেতে বল্‌ছেন, সে কথাটা আর গোপন করে কি করব। মা-লক্ষ্মী আমাকে সরে যেতে বল্‌ছেন। এত কাল এই স্বরূপ কর তাঁর ঘাঁটি আগ্‌লে বসে ছিল। সে আর এখন থাক্‌তে দিলে না, তাই যাচ্ছি। কি করব, বুড়ো বয়সে আর তোমাদের দুর্গতি দেখ্‌তে না হয়, তাই আমি আগেই চল্‌লাম। মাধব, চেষ্টা করে দেখ, বুড়োর নামে যদি দুই চার নম্বর দেওয়ানী ফৌজদারী করতে পার।"

এই বলিয়াই চল্লিশ বৎসরের কর্ম্মচারী স্বরূপ কর বড়বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কার্ত্তিক একটী কথাও বলিতে পারিলেন না।

[১৭]

কথাটা গোপন থাকিল না। কর মহাশয় চলিয়া যাওয়ার পরই এই সংবাদ বাড়ীর মধ্যে পৌঁছিল। তারক এ কয়দিন বাহিরেও আসেন না, কাছারী-ঘরেও বসেন না, কাজকর্ম্মও দেখেন না; সমস্ত দিন ঘরের মধ্যেই থাকেন, কেবল স্নান

আহারের জন্য এক একবার বাহির হন। সুপ্রভা তাঁহার নিকট সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন। তিনি যখন তখনই বলিতেন 'তুমি ভয় করছ কেন? ভগবান্‌কে ডাক, তিনিই সব বিপদ কাটিয়ে দেবেন। দেখ, বড়-ঠাকুর ছেলেমানুষ নন, তিনি মূর্খও নন, অবিবেচকও নন। আমাদের অদৃষ্টের দোষে তাঁর মনের উপর একখানি মেঘ এসেছে; সে মেঘ কতক্ষণ থাক্‌বে? দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব আপদ কেটে যাবে। এ সময় তুমি অমন ক'রে থাক্‌লে হবে না। যেমন কাজকর্ম্ম করছিলে, ঠিক তাই ক'রে যাও।'

তারক বলিলেন "সুপ্রভা, তুমি বুঝতে পারছ না, আমার বুকে কি ব্যথা লেগেছে। আমার আর কাজকর্ম্ম করবার শক্তি নেই; আমার বুক ভেঙ্গে গিয়েছে। কি যে করব, তা ঠিক করে উঠতে পারছি নে। একএকবার মনে হচ্চে বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাই। কিন্তু কোথায় যাব?"

সুপ্রভা বলিলেন "সে কি কথা? তুমি এমন অধীর হ'লে চল্‌বে কেন? আমরা তা হ'লে কোথায় যাব?"

তারক বলিলেন "তোমাদের কথাই ত আমি ভাবি। আমি যদি একা হতাম, তা হ'লে যে দিন এই কথা শুনেছিলাম, সেই দিনই দেশত্যাগ করতাম। কিন্তু তা ত পারি নে সুপ্রভা! তুমি আছ, স্বর্ণ আছে; আর আছেন হতভাগিনী ছোট-বৌমা। তোমাদের কার হাতে দিয়ে যাব!"

সুপ্রভা বলিলেন "কারও হাতে দিতে হবে না। আমি

বল্‌ছি, বড়ঠাকুর শীঘ্রই তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন। দশজনের কথায় কি তিনি তোমার পর হ'য়ে যাবেন ?"

তারক বলিলেন "সুপ্রভা, এতকাল ত সেই কথাই বিশ্বাস করে এসেছি। কিন্তু, এখন কি হোলো! দাদা আমাকে চোর মনে করেছেন। এ দুঃখ যে আমার রাখবার স্থান নেই। আমার দাদা——সুপ্রভা, আমার দাদা——" তারক কাঁদিয়া ফেলিলেন। সুপ্রভাও চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। অবশেষে সুপ্রভা বলিলেন "দেখ, আমি একটা কথা বলি। বড়ঠাকুরকে কিছুই ব'লে কাজ নেই; এ বাড়ীতেও থেকে কাজ নেই। যে বাড়ীতে তোমার অপমান হয়, সে বাড়ীতে আর থাকা নয়। আমাকে আর স্বর্ণকে নিয়ে তুমি রাইগঞ্জে চল। তার পর যা হয় হবে।"

তারক বলিলেন "সে হয় না সুপ্রভা! একবার ত তাই মনে করেছিলাম যে, তোমাদের রাইগঞ্জে পাঠিয়ে দিয়ে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু, তুমি ত আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে চাইবে না। আর এ সময় তোমাকে ছেড়ে আমিও থাক্‌তে পারব না। এখন এই সংসারে তুমি ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই। তুমি আমাকে রাইগঞ্জে যেতে বল্‌ছ; কিন্তু এ সময়ে কি কোনখানে যাওয়া আমার উচিত? না সুপ্রভা, এই মনোহরপুর ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। আবার তাও ভাবি যে, এখানে কেমন করে থাকি। ভগবান্ আমার অদৃষ্টে এ কি লিখেছেন। আজ আমার

সুরেন্দ্রের শোক নূতন ক'রে বাজ্‌ছে। আজ যদি সে বেঁচে থাক্‌ত, তা হ'লে কি এ বিপদ হ'তে পারত! শেষে চোর বদ্‌নাম আমার ছিল! আর সে বদ্‌নাম দিলেন কি না আমার দাদা—যাঁকে আমি পিতার মত মান্য করি—সেই আমার দাদা! এ দুঃখ যে আমার মরিলেও যাবে না সুপ্রভা!"

সুপ্রভার বুকে তারকের প্রত্যেক কথা শেলের মত বিদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু সে কোন দিকে কোন উপায়ই চোখে দেখিতে পাইল না। কি বলিয়া স্বামীকে এ বিপদে যে সান্ত্বনা, সুপরামর্শ দিবে, তাহাও ভাবিয়া পাইল না।

এই সময় সেই ঘরের দ্বারে কে যেন মৃদু করাঘাত করিল। তারক সে শব্দ শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু সুপ্রভার কর্ণে সে শব্দ পৌঁছিল। তিনি বলিলেন "তুমি একটু বোসো, বোধ হয় ছোট-বৌ আমাকে ডাক্‌ছে; আমি শুনে আসি।" এই বলিয়া সুপ্রভা ঘরের বাহিরে গেলেন।

রঙ্গিনী এতক্ষণ দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তারক ও সুপ্রভার কথা শুনিতেছিল; তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে স্থির থাকিতে না পারিয়া দ্বারে করাঘাত করিয়া সে সুপ্রভাকে ডাকিল।

সুপ্রভা বাহিরে আসিয়া বলিলেন "ছোটবৌ, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?" রঙ্গিনী বলিল "আমি এতক্ষণ তোমাদের কথা শুন্‌ছিলাম। শেষে যখন অসহ্য হ'ল, তখন তোমাকে ডাক্‌লাম। মেজদিদি! দেখ, তোমরা যে কেন এমন করছ,

তা ত আমি ভেবে পাইনে! বড়-ঠাকুরকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলেই হয়, তিনি কি চান? তিনি মনে করেছেন, মেজ-ঠাকুর টাকা চুরী করে, মিথ্যা-মিথ্যি খরচ লিখেছেন। যে বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সম্বন্ধে এমন অন্যায় কথা বলা দূরে থাক, ভাবতেও পারেন, তাঁর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে নেই—তাঁর মুখও দেখ্‌তে নেই। এমন মহাদেবের মত ভাইকে যিনি চোর বল্‌তে পারেন, তিনি আমার বাবা হ'লেও আমি তাঁকে ক্ষমা করিনে। তোমরা এই সব কথা শুনেও চুপ ক'রে বসে আছ! আমার কথা শোন; চল আমরা এ বাড়ী থেকে চলে যাই। এ পাপ সংসারে আমরা থাক্‌ব না। আর টাকার কথা বল্‌ছ? কত টাকা? ত্রিশ হাজার টাকা ত? এ টাকা আর সংগ্রহ হবে না? তোমার আর আমার গয়না বিক্রী করলে যেমন করে হোক, পাঁচ ছয় হাজার টাকা ত হবে। তুমি যদি বল, তা হ'লে আমি মাকে সব কথা খুলে লিখে দিই; মার হাতে যে টাকা আছে, তার থেকে তিনি আমাদের নিশ্চয়ই পঁচিশ হাজার টাকা দেবেন। তার পর আমরা শোধ করতে পারি—ঈশ্বর যদি সে দিন দেন—তখন আমরা শোধ করব; আর না দিতে পারি, তাতেই বা কি? ও টাকা ত মা আমাকেই দিতে চেয়েছিলেন। সেই টাকা নিয়ে এসে বড়ঠাকুরের মুখের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমরা চলে যাই। তার পর দেখ্‌ব যে, এ জমিদারী কে রক্ষা করে? মেজঠাকুরকে চোর বল্‌বে, আর আমরা তাই দাঁড়িয়ে শুন্‌ব?—তোমরা না পার,

চুপ ক'রে থাক। আমার আর কি? আমি আর সংসারে কি দেখে ডরাব? আমার সে ভয় ডর নেই। বিধবার আবার ভয় কি? তুমি বল, মেজঠাকুরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এস, আমি কেমন আগুন জালিয়ে দিই, দেখ। আমার মেজঠাকুর চোর? কি বল্‌ব দিদি! রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে যাচ্ছে। তুমি শুনে এস! তার পর আমার যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেও, আমি টাকা নিয়ে আসি।"

স্বপ্রভা বলিলেন "ছোটবৌ, বোনটি আমার, অত রাগের সময় এখন নয়। টাকার কথা আমিও ভাবি নে। আমি রাইগঞ্জে পত্র লিখ্‌লে এখনই কিছু টাকা নিয়ে আস্‌তে পারি। কিন্তু কি বলে টাকা দিতে চাচ্ছ? লোকে কি মনে করবে? হয় ত বল্‌বে, সত্যিই উনি টাকা সরিয়েছিলেন; এখন গোলমাল হ'তে সব বা'র করে দিলেন। এতে যে অপরাধ স্বীকার করা হয়।"

রঙ্গিনী রাগিয়া উঠিয়া বলিল "অপরাধ স্বীকার কি? আমরা কি চোরের মত টাকা দিতে চাচ্ছি? দশজনকে জানিয়ে, দশজনকে সকল কথা বলে, কেমন করে আমরা কোথা থেকে টাকা এনেছি, কেন দিতে যাচ্ছি, সে কথা গ্রামের দশজনের সম্মুখে স্পষ্ট ক'রে ব'লে তবে ত টাকা দেব। তাতে যদি তোমাদের মত না হয়, তা হলে মেজঠাকুরকে বল, তিনি যেন বড়ঠাকুরের মুখের উপর বলেন যে, তিনি কাউকে হিসেব দিতে বাধ্য নন; বড়ঠাকুরের মনে সন্দেহ হ'য়ে থাকে,

তিনি নালিশ করে টাকা আদায় করে যেন নেন। তাঁকেই বাঁচাতে গিয়ে এত কাণ্ড হোলো, আর শেষে কি না, তিনিই বলেন চোর!"

সুপ্রভা বলিলেন "না, না, বোন, অমন কথা মুখে আনিস্ নে। বড়ঠাকুর গুরুজন, তাঁর নিন্দা করতে নেই। তিনি দশজনের কথায় ভুলে এমন কাজ করছেন। যখন নিজের ভুল বুঝতে পারবেন, তখন তিনিই লজ্জায় যে মরে যাবেন!"

রঙ্গিনী আরও রাগিয়া গেল, ঘরের মধ্যে যে তারক বসিয়া আছেন, সে কথাও সে বিস্মৃত হইল। চীৎকার করিয়া বলিল "কেন বল্‌ব না—একশ বার বল্‌ব। এমন করে যিনি অন্যায় করতে পারেন, এমন করে যিনি মেজঠাকুরের মত মানুষকে চোর বল্‌তে পারেন, তাকে ব্যথা দিতে পারেন, তাঁকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি নে। এ ত বড়-ঠাকুর;—আজ যদি তিনি বেঁচে থাক্‌তেন, আর তিনি যদি এমন কথা মুখ দিয়ে বা'র করতেন, তা হ'লে—তা হ'লে আমি তাঁকেও ক্ষমা করতাম না। যিনি যতক্ষণ ভাল, ততক্ষণ তাঁকে মাথায় রাখবো; কিন্তু তাই বলে যখন অন্যায় করবেন, তখনও তাঁকে ভাল বলতে হবে, এ শাস্ত্র আমি জানিনে—তা তিনি যিনিই হোন। এ কি অন্যায় কথা! এমন অপবাদও সহ্য করতে হবে?"

সুপ্রভা বলিলেন "রঙ্গিনি, তাই করতে হয়। দশজন

নিয়ে বাস করতে গেলে অনেক সইতে হয় বোন! তুমি ছেলে মানুষ, তাই তোমার এত অসহ্য বোধ হচ্চে।"

রঙ্গিনী বলিল "মেজদিদি, তোমাদের মত এত সহ্য করবার শক্তি আমার নেই—আর তা থেকেও আমার কাজ নেই—এমন দশজনকে নিয়ে আমি ঘর করতে চাইনে। আমার ত কিছুই নেই—তোমরা যদি না থাক্‌তে, তা হলে কোন্ দিন আমি মরে যেতাম। তোমাদের দিকে চেয়েই আমি বেঁচে আছি। সেই তোমাদের এত অপমান, এত নির্য্যাতন;—আর আমি তাই ব'সে ব'সে দেখব—তা কিছুতেই হবে না—কিছুতেই না।"

এত দুঃখেও সুপ্রভার হাসি আসিল; তিনি বলিলেন "তা হলে তুই কি করতে চাস্ বল ত। কোমর বেঁধে দাঙ্গা করতে যাবি না কি?"

রঙ্গিনী বলিল "হেস না মেজদিদি! আমি যদি বেটা ছেলে হতুম, তা হ'লে যেদিন এ কথা আমার কাণে গিয়েছিল, সেই দিনই একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতুম। তাতে যা হয় হোতো। অন্যায় আমি সহ্য করতে পারিনে—পারবও না।"

সুপ্রভা তেমনই হাসিয়া বলিলেন "তা, তুই ত আর পুরুষ মানুষ নয়। এখন মেয়েমানুষ হ'য়েই তুই কি করবি, তাই বল্।"

রঙ্গিনী বলিল "বল্‌ব আবার কি? চোর বল্‌লেই

চোর! মুখে আর কথা আট্‌কায় না! আমি হলে কি করতুম জান? ঐ বিটলে বামুনটাকে ঘাড় ধ'রে বাড়ীর বা'র করে দিতাম—কিছুতেই এই বড়বাড়ীর সীমানার মধ্যে ঢুকতে দিতাম না। তার যা সাধ্য থাকে, সে করত। কেন? এ বাড়ী কি একেলা বড়ঠাকুরের? তোমরা কি কেউ নও? আমারই না হয় কপাল পুড়ে গিয়েছে, আমিই না হয় একবেলা দুটো আলোচা'লের বরাত নিয়ে এ বাড়ীতে এসেছিলাম। কিন্তু, তোমরা ত তা নও। তোমরা অমন করে থাক কেন? কথা বল্‌লেই অমনি হোলো!"

সুপ্রভা বলিলেন "যা, তুই এখন তোর ঘরে যা! মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর গিয়ে। তোর আজ কি হয়েছে?"

রঙ্গিনী বলিল "কি আর হবে? আজ কয়দিন আমি রাগ চেপে রেখেছিলুম। মেজঠাকুরের কথা শুনে আজ আর থাক্‌তে পারলাম না।"

সুপ্রভা বলিলেন "না, আর তোকে একলা ছেড়ে দিতে পারছিনে। তোর যে রকম রাগ হয়েছে, তাতে তুই লজ্জা সরম ত্যাগ করে এখনি হয় ত একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলতে পারিস। চল তোর ঘরে যাই।" এই বলিয়া সুপ্রভা রঙ্গিনীকে টানিয়া লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলন।

তারক ঘরের মধ্যে বসিয়া সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তখন ভ্রাতৃশোক উথলিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতেছিল; আর শুধু মনে

হইতেছিল, আজ যদি সুরেন্দ্র বাঁচিয়া থাকিত, তাহ'লে কি এমন করিয়া তিনি নিরাশ্রয় হন। আর ছোট-বৌমা;—কি তাহার মনের বল, কি তাহার শ্রদ্ধা ভক্তি, কি তার অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ। হায়! ভগবান্ এমন হৃদয়ে এ কি শেল হানিয়াছ প্রভু! তাঁহার মনে হইতে লাগিল, কি তাঁহার ছিল না—সুরেন্দ্র-মহেন্দ্রের মত ভাই, ছোট বৌমার মত ভ্রাতৃজায়া, আর সুপ্রভার মত পত্নী! অমন অদৃষ্ট কাহার! কিন্তু, কিছুই ত তাঁহার সহিল না। সুরেন্দ্র—তাঁহার প্রাণের ভাই সুরেন্দ্র সর্পাঘাতে জীবন বিসর্জ্জন দিল; তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, সুখ-দুঃখের সঙ্গী মহেন্দ্র নিরুদ্দেশ হইল, আর অভাগিনী ছোট-বৌমা—সেই দেবী আজ কি মর্ম্মযন্ত্রণাই ভোগ করিতেছেন। হায় দাদা! কেন তুমি এমন কাজ করিলে? কেন তুমি এই সংসারের মধ্যে এমন আগুন জালিয়া দিলে? এতে যে সব যায়,—সব যায় দাদা—সব যায়!

তারক আর ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; বারান্দায় গেলেন। বেলা তখন প্রায় নয়টা। বারান্দার সম্মুখে নীচের উঠান দিয়া এক জন চাকর কাছারী-বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। তারক তাহাকে ডাকিয়া, কর মহাশয়কে এক বার বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া চাকরটী বলিল "মেজ বাবু, কর মশাই ত কাছারীতে নেই।"

তারক বলিলেন "তিনি কি আজ আসেন নাই?"

চাকর বলিল "তিনি এসেছিলেন, বড়বাবুর কাছে কৰ্ম্মে ইস্তফা দিয়ে বাড়ী চলে গেছেন।"

তারক মাথায় হাত দিয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন।

[১৮]

বড়বাড়ীতে যে ভাইয়ে-ভাইয়ে মনান্তর হইয়াছে, এ সংবাদ শাখা-পল্লবে সুশোভিত হইয়া গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে প্রচারিত হইল। এই প্রচারের মধ্যে যে মাধব ঠাকুরের হাত ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। গ্রামে প্রচার হইল যে, একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামার আর বিলম্ব নাই; কার্ত্তিক ও তারক দুই ভাই-ই গোপনে লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতেছেন। এমন কি দুই চারিজন সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা পাটকেবাড়ীর কাছারীতে পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল দেখিয়া আসিয়াছে; কেহ বলিল যে, স্বরূপ কব চাকরী ইস্তাফা দিয়া মেজবাবুর পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন; একজন বলিল "আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম স্বরূপ কর থানার দারোগাকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য হাজার টাকার এক তোড়া দারোগা বাবুকে দিলেন।" কেহ বলিল "মল্লিক বাবুদের সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য মেজবাবু লোক পাঠিয়েছেন।" বৃদ্ধেরা সন্ধ্যা-আহ্নিক ভুলিয়া গিয়া দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন যে, মা-লক্ষ্মী মনোহরপুরের বড়বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন; তবে তিনি যে কোন্ ভাগ্যবানের গৃহে গেলেন, সে কথা কেহই নিশ্চিত বলিতে পারিলেন না;

আকারে ইঙ্গিতে কেহ জানাইলেন যে, এবার মাধব ঠাকুরের পোয়া-বারো।

এত বড় ব্যাপারটা যখন দশ গ্রামের লোক শুনিল, তখন শ্যামপুরের নিতাই কুণ্ডু যে কাণে তুলা দিয়া বসিয়াছিল, এ কথা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? নিতাই কুণ্ডু ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া বিলক্ষণ দুই পয়সা সঞ্চয় করিয়াছে। এখন বৃদ্ধ বয়সে আর কাজ কর্ম্ম দেখিতে পারে না, নানা আড়তে ঘুরিতে পারে না, পূর্ব্বের মত খাটিবারও শক্তি নাই। একমাত্র পুত্র রাধাবল্লভ কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছে; সুতরাং সে আর কেমন করিয়া আড়তে বসিয়া মালপত্র কেনাবেচা করে। এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া বৃদ্ধ নিতাই কুণ্ডু আড়ত-গুলি তুলিয়া দিয়াছে, আট দশখানি বড় বড় নৌকা ছিল, তাহা বেচিয়া ফেলিয়াছে; সে নগদ টাকার কারবার করে এবং দুই বেলা হরিনাম করিতে করিতে সুদের হিসাব করে। বিনা বন্ধকে বা মর্টগেজে সে প্রায় কাহাকেও টাকা ধার দেয় না; এবং টাকা আদায়ের সময় আধটা পয়সাও কাহাকে রেয়াত দেয় না। তবে ও অঞ্চলের সকলেই বলিয়া থাকে যে, শ্যাম-পুরের নিতাই কুণ্ডু নিজেও এক পয়সা ঠকে না, কাহাকে এক পয়সা ঠকায় না।

এই নিতাই কুণ্ডুর নিকট হইতেই তারক বেশী সুদে নিজের হাতচিঠাতেই ত্রিশ হাজার টাকা ধার করিয়াছিলেন। মনোহরপুরের বড়বাড়ীতে টাকা ধার দিবার সময় নিতাই

কোন প্রকার মর্টগেজ লয় নাই; কারণ, সে জানিত, তাহার টাকা মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু যে দিন নিতাই কুণ্ডু শুনিল যে, দুই ভাইয়ে মনান্তর হইয়াছে এবং শীঘ্রই একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সুতরাং প্রকাণ্ড ফৌজদারী মামলা সুরু হইবে, তখন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। এক আধ শত টাকা নহে—ত্রিশ হাজার টাকা। বড়বাড়ীতে বিরোধ লাগিয়াছে; এ সময় টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না করিলে সাত হাত জলের নীচে পড়িতে হইবে।

অন্য কোন খাতক হইলে টাকার তাগাদার জন্য সে গোমস্তাকে পাঠাইত। কিন্তু এখানে ত গোমস্তা পাঠান যায় না; মনোহরপুরের মিত্র বাবুরা বনিয়াদি ঘর, বড়মানুষ, মানী লোক। গোমস্তা হয় ত কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে; শেষে কি নিতাই কুণ্ডু হইতে মানী লোকের মান নষ্ট হইবে! বিশেষতঃ সে যে প্রকার সংবাদ পাইল, তাহাতে অবিলম্বেই একটা ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন; গোমস্তার দ্বারা তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। এই সকল চিন্তা করিয়া বৃদ্ধ নিতাই কুণ্ডু নিজেই মনোহরপুর যাত্রা করা স্থির করিল।

মনোহরপুর শ্যামপুর হইতে তিন ক্রোশ পথ। পুত্র রাধাবল্লভ যখন শুনিল যে, তাহার পিতা মনোহরপুর যাইবে, তখন সে বলিল "বাবা, আপনি বুড়া মানুষ; আপনি থাকুন,

আমিই যাই।” নিতাই কুণ্ডু বলিল “আরে, সেখানে গিয়ে কি তুমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। আর শুনছো ত, তাঁদের ভাই-ভাইয়ে গোল লেগেছে। এই গোলের মধ্যে গিয়ে কি কাজ গোছানো তোমার মত ছেলেমানুষের কাজ। অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হবে। তোমার গিয়ে কাজ নেই, আমিই যাই।” রাধাবল্লভ বলিল “তাহ’লে একখানা পাল্‌কী আন্‌তে পাঠান। বড়মানুষের বাড়ী যেতে হবে, পথও তিন্‌ ক্রোশ!” নিতাই হাসিয়া বলিল, তাহ’লেই তুমি আমার কারবার রক্ষে করেছ। ওরে বাবা, তোমার মত বয়সে আমি এক চোটে চোদ্দ ক্রোশ পথ হেঁটেছি। এমন দিন যায় নাই, যে দিন চার পাঁচ ক্রোশ পথ না চলেছি; তা কেবা জানে দুপুর রাত্রি আর কেবা জানে ঝড় বৃষ্টি। আজ বুড়ো হয়েছি বলে কি এই তিন ক্রোশ পথ চল্‌তে পারব না? এত কষ্ট করে তবে এই সামান্য যা কিছু করেছি। এই বেলাটা একটু গড়ালেই রওনা হব; চার পাঁচটার মধ্যেই মনোহরপুর যাব; আর সেখানকার ব্যবস্থা করে, এই চার দণ্ড এক প্রহর রাত্রের মধ্যেই বাড়ী এসে পড়ব; গাড়ী পাল্‌কী চড়লে কি আমাদের ব্যবসা চলে।” রাধাবল্লভ আর কথা বলিল না।

নিতাই কুণ্ডু বেলা একটার সময় যাত্রা করিয়া তিনটার পরই মনোহরপুরে উপস্থিত হইল। তাহার একবার মনে হইল যে আগে অন্য কোন বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত অবস্থাটা বিশেষ করিয়া জানিয়া লইয়া তাহার পর বড়বাড়ীতে যাইবে; কিন্তু

তাহা হইলে বিলম্ব হইয়া যাইতে পারে, এই ভাবিয়া সে একবারে বড়বাড়ীতে গিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক ও মাধব ঠাকুর তখন কাছারী ঘরের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। নিতাই কুণ্ডু সেই বারান্দায় উঠিতেই কার্ত্তিক বলিলেন "আরে এস এস, কুণ্ডু মশাই এস।" নিতাই তখন প্রথমে বড়বাবুকে নমস্কার করিয়া পরে মাধব ঠাকুরকে প্রণাম করিল এবং ঠাকুরের দিকে একটু বক্র দৃষ্টি করিয়া কার্ত্তিকের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কার্ত্তিক বলিলেন "কুণ্ডু মশাই, ঐ বেঞ্চিখানার উপর বোস। বাড়ীর সব কুশল ত?" নিতাই বলিল "আপনাদের আশীর্ব্বাদে এক রকম প্রাণগতিক।"

কার্ত্তিক বলিলেন "তার পর, আজ হঠাৎ কি মনে করে উপস্থিত?" এই বলিয়াই তিনি মাধব ঠাকুরের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি করিলেন; মাধব ঠাকুরও চক্ষু টিপিয়া কি যেন ইঙ্গিত করিল।

নিতাই বলিল "একটা প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।"

কার্ত্তিক বলিলেন "এমন কি প্রয়োজন পড়ল যে, তুমি বুড়ো মানুষ এই তিন ক্রোশ পথ হেঁটে এলে?"

নিতাই কেমন করিয়া যে কথা আরম্ভ করিবে, তাহা বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। রাস্তায় আসিতে আসিতে যাহা স্থির করিয়া আসিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গেল।

বিশেষ মাধব ঠাকুর যে এ সময়ে উপস্থিত থাকিবে, নিতাই তাহা মনে করে নাই। তাই সে একটু চিন্তা করিয়া বলিল "বড় বাবু, আমার টাকাগুলির কি ব্যবস্থা হবে, তাই আপনার কাছে জান্‌তে এসেছি।"

কার্ত্তিক কথা বলিবার পূর্ব্বেই মাধব ঠাকুর বলিয়া বসিল, "কোন্ টাকার কথা বল্‌ছ কুণ্ডুর পো?"

নিতাই বলিল "সে কি তুমি জান না ঠাকুর!" এই বলিয়াই কার্ত্তিককে বলিল "বড় বাবু, অনেকগুলি টাকা, একটু ভাল রকম পাকা কথার দরকার।"

কার্ত্তিক মাধব ঠাকুরের এক কথাতেই তাহার ইঙ্গিত বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "কোন্ টাকার কথা কুণ্ডু মশাই?"

নিতাই কুণ্ডু এই প্রশ্ন শুনিয়াই আসল মতলবটা বুঝিয়া ফেলিল, সে অতি ধীরভাবে বলিল "এই সে-দিন মামলা উপলক্ষে আপনারা যে ত্রিশ হাজার টাকা নিয়েছেন।"

কার্ত্তিক বলিলেন "আমরা? কৈ আমি ত তোমার কাছে যাই নাই, আমি ত টাকা নিই নাই!"

মাধব ঠাকুর বলিল "তা হ'লে কুণ্ডুর পো, তুমি 'আপনারা' কথাটা বললে কেন?"

নিতাই একটু রুক্ষস্বরে বলিল "ঠাকুর, তুমি কথা বল্‌তে আস্‌ছ কেন? তোমার সঙ্গে ত আমি কথা বল্‌ছি নে।" কার্ত্তিককে সে বলিল "বড় বাবু, আমি ত জানি, যে আপনি

সেই মেজ বাবু; মেজবাবু নিলেই আপনার নেওয়া হল। সরকারী কাজের জন্য যিনিই নেন, তাই সরকারী নেওয়া, এই ত জানি, আর এই জেনেই ত টাকা দিয়েছি।"

কার্ত্তিক বলিলেন "আমার ঘরে কি টাকা ছিল না, যে তোমার কাছে ধার করতে হবে?"

নিতাই বলিল "বড় বাবু, মনে কিছু করবেন না; আপনার মুখে যে এ কথা শুনব, তা জেনেই আমি এসেছি। বিশেষ, এখানে যখন দেখলাম, মাধব ঠাকুর বসে আছে, তখনই সব বুঝে ফেলেছি। আমরা বাবু, এক কথার মানুষ, এক কথায় টাকা দিই, এক কথায় আদায় করি। আপনাকে সোজা কথায় জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি এ টাকা দেবেন না?"

কার্ত্তিক বলিলেন "আমি ত তোমার কাছে টাকা ধার করি নাই, হাতচিঠাও সই করি নাই যে, আমি টাকা দেব। যে টাকা নিয়েছে, তার কাছ থেকে আদায় কর গে। আমি ও-টাকার জন্য দায়ী নই। যে টাকা নিয়ে বাক্সে তুলেছে, সেই শোধ দেবে।"

কার্ত্তিকের মুখে এই কথা শুনিয়া নিতাই কুণ্ডু বড়ই বিষণ্ণ হইল। তখন সুযোগ পাইয়া মাধব ঠাকুর বলিল "কুণ্ডুর পো, আর ভেবে কি করবে, তোমার টাকা আদায় অনেক দূর।"

নিতাই এ বিদ্রূপ নীরবে সহ্য করিতে পারিল না; সে অতি কর্কশ স্বরে বলিল "মাধব ঠাকুর, টাকার জন্য

আমি ভাবছি নে; বড়বাড়ীর মিত্তিরদের যখন টাকা ধার দিয়েছি, তখন টাকা আমি পাব, সে বিশ্বাস আমার আছে। আমি কি ভেবে কাতর হয়েছি, শুন্‌বে? বড়বাবু, কিছু মনে করবেন না; আমার বড় গরব ছিল যে, আমি খুব লোক চিনি, আজ আপনার কথা শুনে আমার সেই গরব নষ্ট হ'য়ে গেল,—এই ভেবেই আমি কাতর হয়েছি। মনোহরপুরের মিত্তিরদের ছেলের মুখে এমন কথা শুন্‌ব, এ আমি কোন দিন ভাবিনি। যাক্ সে কথা; আমাকে এখনই বাড়ী ফিরে যেতে হবে। বড়বাবু, দয়া করে একবার মেজবাবুকে ডেকে দিলে তাঁর মুখের কথা শুনে যাই; তার পর যা হয়, সে দেখব।"

কার্ত্তিক তখন একজন চাকরকে ডাকিয়া মেজবাবুকে সংবাদ দিতে বলিলেন; এবং নিতাই কুণ্ডুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "কুণ্ডু মশাই, একটু চাপাচাপি ক'রে ধরলেই টাকাটা পেয়ে যাবে; টাকা ওর কাছেই আছে, বুঝলে? চরের মামলায় যা খরচ হয়েছে, সে টাকা আমাদের ঘরেই ছিল।"

নিতাই কুণ্ডু বলিল "বড়বাবু, সে খরচ আপনার চাইতে আমি বেশী জানি। মল্লিক বাবুরাও আমার কাছ থেকেই টাকা নিয়েছিলেন; কার কত খরচ হয়েছে, সে আমার বেশ জানা আছে।"

মাধব ঠাকুর বলিল "মল্লিকরা তোমাদের কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছে কুণ্ডুর পো?"

নিতাই বলিল "তুমি ত আচ্ছা লোক হে! তোমাকে সে কথা বল্‌তে গেলাম কেন? তারা কি সে দেনা রেখেছে, সব টাকা মায় সুদ শোধ করে দিয়ে গিয়েছে—পনর দিনও রাখে নাই। এঁরাও শোধ দিতে পারতেন; তবে তুমি যখন এসে স্কন্ধে ভর করেছ, মাধব, তখন আর বড়বাড়ীর মঙ্গল নেই। মল্লিক মহাশয় ব'লে পাঠিয়েছেন যে, আমি যেন কিছু টাকার যোগাড় রাখি; তাঁরা শীগ্‌গিরই মিত্তিরদের জমিদারী কিন্‌তে পারবেন। কথাটা তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম; আজ তোমাকে এখানে দেখে আর আমার সন্দেহ রইল না; বড়বাড়ীর জমিদারী মল্লিক বাবুদেরই হাতে যাচ্ছে।"

নিতাই কুণ্ডুর মুখে এমন কথা শুনিয়া কার্ত্তিকের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার আর কিছু বলা হইল না, কাছারীর প্রাঙ্গণে তারককে দেখিয়া তিনি নীরব হইলেন।

তারক ধীরে-ধীরে কাছারী ঘরের নিকটে আসিলেন। বারান্দায় না উঠিয়া, নীচে দাঁড়াইয়াই বলিলেন, 'কুণ্ডু মশাই কি আমাকে ডেকেছেন?"

তারককে আসিতে দেখিয়াই নিতাই কুণ্ডু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে তখন নমস্কার করিয়া বলিল, "মেজবাবু, একটা কথা আছে; আপনি উপরে উঠে আসুন।"

তারক বলিলেন "আপনার কি কথা বলুন, আমি এখান থেকেই শুন্‌ছি।" এই কথা শুনিয়া নিতাই কুণ্ডু বারান্দা

হইতে নীচে নামিয়া গিয়া বলিল, "মেজবাবু, সেই ত্রিশ হাজার টাকার জন্য এসেছিলাম। তা বড়বাবু বল্লেন যে, সে টাকা সরকারী খরচের জন্য না কি নেওয়া হয় নাই; সে টাকা আপনিই নিয়েছেন; আপনাকেই—"

নিতাই কুণ্ডুর কথায় বাধা দিয়া তারক বলিলেন, "সে কথা ঠিক, কুণ্ডু মশাই! টাকাটা আমিই নিয়েছি, আমিই খরচ করেছি। দাদা ত সে টাকা নেন নি, তিনি খরচও করেন নাই। আপনার টাকাটা আমিই শোধ দেব। তবে দয়া করে আমাকে একমাসের, নিতান্ত না হয় পনর দিনের সময় দিতে হবে। এই সময়ের মধ্যে আমি যেমন করে হোক, টাকা শোধ করে দেব। আপনি কি আমার এ কথার উপর নির্ভর করতে পারবেন না?"

নিতাই কুণ্ডু অবাক্ হইয়া গেল। তাহার সুদীর্ঘ জীবন-কালে সে অনেক লোক দেখিয়াছে, অনেক লোকের সঙ্গে কারবার, লেনদেন করিয়াছে; কিন্তু এমন মানুষ ত সে কখন দেখে নাই! সে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া মেজবাবুর মুখের দিকে চাহিল; দেখিল তাহার সম্মুখে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি মানুষ নহেন—দেবতা।

নিতাই কুণ্ডু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিস্ময় দমন করিল। তাহার পর বলিল "মেজবাবু, একমাস কেন, আপনার যতদিন ইচ্ছা ততদিন পরে টাকা দেবেন। নিতাই কুণ্ডু আপনার কাছে আর টাকার তাগাদায় আস্‌বে না।

যখন পারেন,—যা পারেন আপনি, তাই দিয়ে আস্‌বেন। আমি সেই টাকা নিয়েই আপনার হাতচিঠা শোধ করে দেব।”

তারক বলিলেন “না কুণ্ডু মশাই, অতদিন লাগ্‌বে না আমি পনর দিনের মধ্যেই মায়সুদ সমস্ত টাকা দিয়ে আস্‌ব। টাকা ত দাদা নেন নি, কুণ্ডু মশাই, আমিই নিয়েছিলাম। তা হ’লে আমি আসি; আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন; আপনার টাকা আমি এই সময়ের মধ্যেই দিয়ে আস্‌ব।” এই বলিয়া, কাতর-নয়নে একবার কার্ত্তিকের দিকে চাহিয়া দৃঢ়পদবিক্ষেপে প্রাঙ্গণ পার হইয়া তারক বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। কাছারীর সমস্ত লোক নির্ব্বাক হইয়া তারকের দিকে চাহিয়া রহিল, কাহারও মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

নিতাই কুণ্ডুই প্রথমে এই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিল। সে বলিল “মাধব, আমার গরব ঠিক আছে; আমি মানুষ চিনি। বড়বাবু, এমন ভাইয়ের সঙ্গে গোলমাল করতে বসেছেন—ভাই, না দেবতা! কলিযুগে এমন ত দেখি নাই—শুনিও নাই। বড়বাবু, আমি বুড়ামানুষ, আপনার বাপের বয়সী লোক। আমি বল্‌ছি, মেজবাবুর চোক দিয়ে যদি এক ফোঁটা জল পড়ে, তা হ’লে আপনাদের মঙ্গল হবে না। টাকা যে কিসে খরচ হয়েছে, তার প্রত্যেক দফার কথা আমি মল্লিক মহাশয়ের কাছে শুনেছি। মেজবাবু এমন ক’রে টাকা খরচ না করলে আপনাকে এতদিন জেলে থাক্‌তে হোতো।

তারই এই পুরস্কার। হায় রে কলিকাল!" এই বলিয়াই বৃদ্ধ নিতাই কুণ্ডু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

মাধব ঠাকুর রহস্য করিয়া বলিল "ও কুণ্ডুর পো, আরে, রাগের চোটে যে যাওয়ার সময় একটা প্রণাম কি নমস্কারও করলে না?"

নিতাই কুণ্ডু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "গোলোক কুণ্ডুর ছেলে নিতাই কুণ্ডু তোমাদের মত বামন কায়েতকে চণ্ডালেরও অধম মনে করে।" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বড়বাড়ীর কর্ত্তা, প্রবল প্রতাপান্বিত মহামহিম জমীদার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র একটী কথাও বলিতে পারিলেন না।

[১৯]

অন্দর মহলের দোতালার যে ঘরে তারক শয়ন করেন, সেই ঘরের পশ্চিমদিকের জানালা খুলিলে কাছারীর ঘর এবং কাছারীর সম্মুখের অঙ্গন বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তারক যখন কুণ্ডু মহাশয় ডাকিতেছে শুনিয়া বাহিরে গেলেন, সুপ্রভা তখন শয়নঘরের একটী জানালা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল, বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন, "হে ভগবান্, এই বিপদে তুমি রক্ষা করিও, উনি যেন কোন গোল না করেন। হে

মা কালী, এই সময়ে ওঁর বুকে বল দিও, উনি যেন অপমানে জ্ঞানশূন্য না হন।”

সুপ্রভা দেখিলেন, তারক কাছারী ঘরের বারান্দার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন, বারান্দায় উঠিলেন না। তাহার পর কি কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। কেহ চীৎকার করিয়া কথা বলিলে সুপ্রভা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখান হইতে শুনিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহা উচ্চৈঃস্বরে হইল না, অতি ধীরে হইতে লাগিল। সুপ্রভা কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার ভয় কমিয়া গেল; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ হইতেছে না। তিনি আরও দেখিলেন যে, কার্ত্তিক কোন কথাই বলিতেছেন না, তিনি নীরবে বসিয়া আছেন। তাহার পরই তারক যখন অন্দরের দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন কুণ্ডু মহাশয় একটু উচ্চ স্বরে যে কথা কয়টি বলিল, তাহা সুপ্রভা বেশ শুনিতে পাইলেন। সে কথায় তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া গেল; তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্বামী দেবতার মত সমস্ত সহ্য করিয়াছেন এবং কুণ্ডু মহাশয়ও তাঁহার কথায় খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন; তিনি তখন করযোড়ে বলিলেন “হে ভগবান্, হে বিপদভঞ্জন, আজ তুমি যেমন দয়া করিয়া আমাদিগকে এই বিপদে রক্ষা করিলে, এই কৃপা যেন চিরদিন থাকে প্রভু! আজ আমরা বড়ই বিপন্ন!” তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সেই সময় রঙ্গিনী কোথা হইতে আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, সুপ্রভা করযোড়ে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। সে তখন দৌড়িয়া সুপ্রভার নিকট যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল "মেজদিদি! ও কি? তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে? মেজঠাকুর কোথায় গেলেন? কি হয়েছে দিদি, আমাকে বল।"

সুপ্রভা রঙ্গিনীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন; তখন তাঁহার কথা বলিবার শক্তি ছিল না। রঙ্গিনী কিছু বুঝিতে না পারিয়া আরও কাতর হইয়া বলিল "ও মেজদিদি, কি হয়েছে আমাকে বল না? আমার যে ভয় করছে!"

সুপ্রভা আর নীরব থাকিতে পারিলেন না; "কিছু হয় নি বোন! মেজবাবু যার কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলেন, শ্যামপুরের সেই কুণ্ডু এসেছিল; মেজবাবু তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন।"

রঙ্গিনী বলিল "তাতে কি হয়েছে? সে কি আর পেয়াদা নিয়ে ধ'রে নিতে এসেছে। টাকা পাবে, দিলেই হোলো। তাতে আর এত ভয় কি?"

সুপ্রভা বলিলেন "টাকার জন্য ভয় নয়। কাছারীতে বড়ঠাকুর ব'সে আছেন, সেই মাধব ঠাকুর আছে, সেই কুণ্ডু আছে।"

"সত্যি নাকি?" বলিয়া রঙ্গিনী তাড়াতাড়ি জানালার নিকট গেল; একবার দেখিয়াই ফিরিয়া বলিল "কৈ দিদি,

মেজঠাকুর ত কাছারীতে নেই ; তাঁকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে ? তিনি কোথায় গেলেন দিদি ?"

সুপ্রভা বলিলেন "তিনি ফিরে এসেছেন। এখনই উপরে আস্‌বেন।" "তা হ'লে আমি যাই" বলিয়া রঙ্গিনী যাইতে উদ্যত হইল। সুপ্রভা তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "না, তুই এখানেই থাক্। তিনি এসে ও-ঘরে বস্‌বেন কি কথা হোলো, তা দুজনেই তাঁর মুখে শুন্‌তে পাব।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই তারক সেই ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুপ্রভা বলিলেন "চল, আমরা পাশের ঘরে যাই, এ ঘরে ছোটবৌ রয়েছে।" তারক আর পাশের ঘরে যাইতে পারিলেন না ; তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়াছিল, তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল ; অতি কষ্টে কান্না সংবরণ করিয়া তিনি এই পথটুকু আসিয়াছিলেন। সুপ্রভাকে দেখিয়াই তাঁহার এতক্ষণের সংযম ভাঙ্গিয়া গেল ; তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে-করিতে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

সুপ্রভা তাঁহার নিকটে বসিয়া বলিলেন "ছি, তুমি অমন করে কাঁদছ কেন ? কি হয়েছে, কি করে এলে বল। কেহ কি তোমায় কোন অপমানের কথা বলেছে ?"

তারক অতি কষ্টে ক্রন্দন সংবরণ করিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "অপমান করলে ত ভালই হ'ত।"

সুপ্রভা বলিলেন—"বড়ঠাকুর কি কিছু বলেছেন ?"

তারক বলিলেন—"না, তিনি একটা কথাও বল্লেন না; তিনি মুখ ভার ক'রে বসে রইলেন। আমার দাদা—একটা কথাও বল্লেন না। তিনি যদি আমাকে দু'ঘা মারতেন, তা হ'লেও কষ্ট হোতো না। তা না ক'রে, নিতাই কুণ্ডু আর মাধব ঠাকুর তাঁর হয়ে কথা বল্‌লে।"

সুপ্রভা বলিলেন—"কি কথা হোলো?"

তারক বলিলেন "কুণ্ডু বলিল যে, দাদা ও-টাকা ধারেন না; সরকারী কাজে ও-টাকা খরচ হয় নাই; আমিই টাকা নিয়েছি, আমাকেই দিতে হবে। আমি তাতে বল্‌লাম, কথা ত ঠিক; টাকা আমি নিয়েছি, দাদা ত নেন নি। ও-টাকা আমি শোধ দেব। আমি নিতাই কুণ্ডুর কাছে পনর দিন সময় নিয়েছি। নিতাই বলে গেল যে, আমার যখন সুবিধে হবে, তখনই সে টাকা নেবে। এমন কি আমার উপর দয়া করে বল্‌লে যে আমি যদি সব টাকা না দিতে পারি, যা আমি দেব, তাতেই নিতাই হাতচিঠা শোধ করে নেবে—আমাকে রেহাই দেবে—আমাকে ভিক্ষা দেবে সুপ্রভা—ভিক্ষা দেবে। যে ভিক্ষা আমার দাদা দিতে পারলেন না—যে অনুগ্রহ আমার ভাই দেখাতে পারলেন না, নিতাই আমাকে সেই অনুগ্রহ করে গেল। দাদা আমাকে বিশ্বাস করেন না—আমাকে চোর মনে করেছেন; কিন্তু যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, যে আমাকে সামান্যই চেনে, সেই নিতাই আমাকে বিশ্বাস করলে! সুপ্রভা, সবাই মিলে আমাকে অবিশ্বাস করলে না কেন? সবাই

আমাকে চোর বল্‌লে না কেন? আমি যে এ যন্ত্রণা সইতে পারছি নে। যাঁর কাছে দয়া, অনুগ্রহ, স্নেহ পাবার দাবী করতে পারি, তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন না,—চুপ করে রইলেন—আর নিতাই কুণ্ডু আমাকে দয়া করে গেল! তার কাছে আমাকে অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হল—দাদার সম্মুখে!"

তারক যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন রঙ্গিনী ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া এক-একটী কথা শুনিতেছিল, আর রাগে গর্জ্জিতেছিল। কিন্তু কি করিবে, বাহিরে আসিবার যো নাই; চেঁচাইয়া রাগ মিটাইবার যো নাই। অবশেষে তারক যখন চুপ করিলেন, তখন রঙ্গিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। সুপ্রভা দ্বারের পার্শ্বেই দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন; রঙ্গিনী দ্বারের অপর দিক্ হইতে হাত বাড়াইয়া সুপ্রভার অঞ্চল ধরিয়া টান দিল। সুপ্রভা ফিরিয়া চাহিতেই রঙ্গিনী হাত ছানি দিয়া তাঁহাকে ডাকিল। সুপ্রভা বলিলেন "একটু দাঁড়া, উনি সুস্থ হ'লে যাচ্ছি।" রঙ্গিনী সে কথা না শুনিয়া আবার অঞ্চল ধরিয়া টানিল। সুপ্রভা তখন অগত্যা ঘরের মধ্যে গেলেন।

রঙ্গিনীর আর লজ্জা-ভয় ছিল না; বাহিরেই তারক বসিয়া আছেন, জোরে কথা বলিলে তিনি শুনিতে পাইবেন, এ ভাবনাই তাহার মনে আসিল না। সে বলিল "মেজদি! এ সব কি হচ্ছে? এমন করে কি চলে? অন্যায় করলে তার সাজা পেতেই"—

সুপ্রভা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ছি ছি, রঙ্গিনী, তুই ও কি বল্‌ছিস! বড়ঠাকুরকে কি অমন কথা বল্‌তে আছে—চুপ কর!"

"কেন চুপ করব? উচিত কথা বল্‌তে আমি কাউকে ডরাইনে—ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও ডরাইনে। বল্‌ব না—খুব বল্‌ব। মেজঠাকুর অমন চুপ করে চলে এলেন কেন? দশ কথা বল্‌তে পারলেন না? বল্‌লেন না কেন—নিতাই কুণ্ডুর কাছে টাকা নিয়ে মামলা না চালালে যে জেলে যেতে হত? উচিত কথা ভগবান্‌কে বলা যায়। উনি যত সয়ে যাচ্ছেন, বড়ঠাকুরের ততই তেজ বাড়ছে। টাকা দেব না,—দেব না বল্‌লেই অমনি হলো? মেজঠাকুর কেন বল্‌লেন না 'কুণ্ডু, নালিশ করে দাও; যার দেনা হবে সেই দেবে।' আমি যদি হতাম, তা হলে—যাক্ গে সে কথা। এখন উনি তৎপনর দিনের মধ্যে টাকা দেবেন বলে এসেছেন; টাকার কি করা যাবে?"

সুপ্রভা বলিলেন "তুই অমন করে রেগে গেলি কেন? তুই চুপ করে থাক্ না। উনি আছেন, আমি আছি, যা হয় করব। তোর—"

রঙ্গিনী রাগিয়া বলিল "তোমরা ত সবই করবে! শুধু দাদা—আর বড়ঠাকুর!"

এত কষ্টেও তারক হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন "ওগো ছোট-বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর, উনি কি বলেন?"

সুপ্রভা বলিলেন "শুন্‌লি! একটু ছোট করেই কথা ক'। ভাসুর ব'লেও লজ্জা নেই? তুই হলি কি?"

রঙ্গিনী বলিল "আমার ভাসুরের মত ভাসুর যদি তোমার থাক্‌ত, তা হলে তুমিও এমনি কথাই বল্‌তে। ওঁকে অপমান করবে, আর আমরা কাণে শুনে চুপ করে বসে থাক্‌ব কেমন?"

সুপ্রভা বলিলেন "তা হ'লে তুই বলিস্‌ কি? তিন জনে মিলে কোমর-বেঁধে ঝগড়া করতে যাব নাকি?"

রঙ্গিনী বলিল "মেজদিদি! আমার যদি সে দিন থাক্‌ত, তা হ'লে দেখতে আজ আমরা কোমর বেঁধে ঝগড়া করতেই যেতাম। তা হ'লে কি আর তোমার পায়ে ধরতে আসি? তা হ'লে কি মেজঠাকুরকে কেউ অপমান করে পার পেয়ে যেত?—এতক্ষণে যে আগুন জ্বলে উঠত!"

সুপ্রভা বলিলেন "আর সেই আগুনে মিত্তিরদের বড়-বাড়ী ছারখার হয়ে যেত। তুই কি তাই চাস্‌ রঙ্গিনী?"

রঙ্গিনী রাগিয়া বলিল "আমি চাই আর না চাই, তুমি আমাকে ছেলে মানুষই বল, আর বদরাগীই বল, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, মনোহরপুরের বড়বাড়ীতে আগুন লেগেছে। এ আগুন নেবাবার সাধ্য কাহারও নাই। তুমি আর মেজঠাকুর যত চেষ্টাই কেন কর না, যত অপমানই কেন সহ্য কর না—বড়বাড়ী গিয়েছে। এমন অবিচার যে বাড়ীতে ঢুকেছে, ভাইয়ের উপর ভাইয়ের এত অবিশ্বাস, এত হিংসা যে

বাড়ীতে হয়েছে, সে বাড়ীর কিছুতেই মঙ্গল নেই—আমি ব'লে রাখছি।"

সুপ্রভা বলিলেন "তা ত শুনলাম, এখন আমাদের কি করতে হবে, তাই তুই বল্ ত—তোর মনের কথা কি ?"

রঙ্গিনী বলিল "আমার ইচ্ছে কি, তাই বলব—শুনবে ? সে দিন তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমাতে আর আমাতে মিলে টাকা শোধ করে দিই—কেমন ? আজ আর আমি তা বল্‌ছি নে। আমার কথা যদি শোন, তা হলে এই জমিদারীতে, এই কারবারে আমাদের যা অংশ আছে, সব বেচে ফেল ; সেই টাকা দিয়ে কুণ্ডুদের ধার শোধ করে, চল—আমরা এ পাপপুরী ছেড়ে চলে যাই। যেখানে-সেখানে গিয়ে আমরা কুঁড়ে বেঁধে থাকব, দিন গেলে শাক-ভাত খাব, সেও ভাল ; কিন্তু এ জমিদারী, এ বাবুগিরি আর নয়। এ কথা কেন বল্‌ছি জান ? মনের যখন অমিল হয়েছে, তখন সুধু এই টাকা দিলেই তা থামবে না, মেজদিদি ! কিছুতেই থামবে না। এই সুধু আরম্ভ। এখন আমি যা বললাম, তাই কর।"

সুপ্রভা বলিলেন "বোন, এ ভিটে, এ বড়বাড়ীর মায়া কেমন করে ছাড়তে আমি ওঁকে বলব ? এ যে মিত্তিরদের সাতপুরুষের ভিঁটে !"

তারক এতক্ষণ বাহিরে বসিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন ; কেহই ত ছোট করিয়া কথা বলেন নাই। এইবার তারক কথা বলিলেন ; কহিলেন "ঠিক কথা, ছোট-বৌমা ঠিক কথা

বলেছেন—খুব পাকা কথা বলেছেন। যে আগুন জ্বলেছে, এতে মিত্রবংশ ছারখার হয়ে যাবে—কিছুই থাক্‌বে না—কিছু না—কিছু না! ঠিক কথা—এই আগুন ভাল করে জ্বল্‌বার পূর্ব্বেই আমাদের পালাতে হবে—আমাদের দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিবিয়ে দেবার সাধ্য আমার হবে না। আমি দাদার পায়ে ধরে কাঁদলেও এ আগুন নিববে না। যতদিন মিত্রদের বিষয়-আশয় আছে, ততদিন নিববে না। নইলে দাদা কি এরূপ হন? বৌমা ঠিক বলেছেন—জমিদারীর অংশ বেচেই ধার শোধ করে, আমার এই সাধের বড়বাড়ী—আমার এই পৈতৃক বাসভূমি মনোহরপুর—আমায় ছেড়ে যেতে হবে। ঠিক কথা—আর বিলম্ব নয়। বৌমা ঠিক উপদেশ দিয়েছেন। আর বিলম্ব নয়।" এই বলিয়াই তারক উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুপ্রভা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিলেন "বেশ ত, বিষয় বেচ্‌তে হয়, তাই করা যাবে। তুমি এখন স্থির হয়ে বস। ভেবে চিন্তে, জেনে শুনে, শেষে যা হয় করা যাবে।"

তারক উন্মাদের ন্যায় বলিলেন "না, না, অনেক ভেবেছি, অনেক চিন্তা করেছি। এ বাড়ী আর রক্ষা পায় না। এখানে হিংসা দ্বেষ ঢুকেছে। এখানে ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি মার্‌তে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে যত শীঘ্র পারা যায়, বেরিয়ে যেতে হবে। আমি অনেক সয়েছি—আর না; সব বেচে চলে যাব। কেউ যেন না বল্‌তে পারে মনোহরপুরের বড়বাড়ীর তারক

মিত্র তার দাদার সঙ্গে বিবাদ করেছে, দাদাকে অন্যায় কথা বলেছে। এই আমার যথেষ্ট! এই আমার যথেষ্ট!"

[২০]

তারক তখনই বাড়ী হইতে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু সুপ্রভা অনেক বলিয়া-কহিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পর সুপ্রভা তারককে বলিলেন "দেখ, নিজের বিবেচনায় এত দিন যাহা করিয়াছ, তাহাতে সকলেই তোমার প্রশংসা বই নিন্দা করতে পারবে না। এমন অবস্থায় পড়লে অনেকেরই মাথা ঘুরিয়া যায়, একটা বিবাদ বাধিয়া উঠে; কিন্তু তুমি এত অপমান সহ্য করেও বিবাদ হ'তে দেও নি। কিন্তু এখন যা করতে চাইছ, তাতে ভাল লোকের পরামর্শ লওয়া দরকার। আমরা সামান্য স্ত্রীলোক; আমরা কি বুঝি। তোমারও এখন যে রকম মনের অবস্থা হয়েছে, তাতে তুমিও ঠিক বলতে পার না যে, তুমি যা ঠিক করেছ, তা উচিত হয়েছে। আমি বলি কি, তুমি একবার কর-কাকার কাছে যাও। তিনি খাঁটি লোক; আর তিনি তোমাকে খুব ভাল-বাসেন। তাই যদি না হবে, তা হ'লে তিনি রাগ করে এত-কালের চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেন না। তিনি বুড়া মানুষ; তোমার বাপের মত। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি যা বলবেন, তাই তুমি কোরো। এখনই একবার তাঁর কাছে যাও।"

তারক বলিলেন "আমিও সেই কথা ভাবছিলাম। কর-কাকার কাছেই যাই। এ বিপদে তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।"

এই বলিয়া তারক কর মহাশয়ের বাড়ীতে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। সুপ্রভা বলিলেন "একজনকে ডেকে দিই, একটা লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে যাক্, অন্ধকার রাত্রি।"

তারক বলিলেন "না, সঙ্গে লোক নিয়ে কাজ নেই। একটু গোপনে যাওয়াই ভাল। অমনিই দাদা তাঁর উপর বিরক্ত হয়েছেন; তার পর যদি জান্‌তে পারেন যে, আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, তা হ'লে তাঁকেও বিপদে ফেলা অসম্ভব নয়। মাধব ঠাকুর না পারে এমন কাজ নেই।"

তারক একাকীই কর মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। কর মহাশয়ের বাড়ী বড়বাড়ী হইতে বেশী দূর নহে। তারক কর মহাশয়ের বাড়ীর মধ্যের উঠানে যাইয়া ডাকিলেন "কাকা, বাড়ীতে আছেন কি?"

স্বরূপ কর মহাশয় তখন অন্ধকারের মধ্যে ঘরের বারান্দায় হরিনামের মালা লইয়া বসিয়াছিলেন। তারকের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তিনি বলিলেন "কে, তারক নাকি?"

তারক বলিলেন "কাকা, আমি আপনার কাছে এসেছি।"

কর মহাশয় বলিলেন "এস বাবা, উপরে উঠে এস। ওরে কে আছিস, আলোটা ধর, আর একখানা আসন এনে দে।"

তারক বারান্দায় উঠিতে-উঠিতে বলিলেন "না কাকা,

আলোর দরকার নেই। আসন দিয়ে কি হবে? আমি আপনার কাছে মাটীতেই বসছি।" এই বলিয়া তারক কর মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন।

কর মহাশয় বলিলেন "না, না, অমন করে বোসো না বাবা! ওরে একটা মাদুর এনে দে।"

চাকর একটা মাদুর আনিয়া দিল; কিন্তু তারক তাহাতে না বসিয়া বলিলেন "কাকা, আপনি বুঝি মালা-জপ করছিলেন? তা আমি একটু বসি, আপনি মালা-জপ শেষ করে নিন।"

কর মহাশয় বলিলেন, "বাবা, এখন আর মালা ফেরানো হবে না। আজ জোর করেই হরিনাম করতে বসেছিলাম; কিন্তু কিছুতেই নামে মন দিতে পারছিলাম না; কেবল তোমাদের কথাই মনে হচ্ছিল। সকাল-বেলা যখন চ'লে এলাম, তখন মনটা একটু খারাপ হ'য়েছিল। তোমাদের সঙ্গে ত আর দুচারদিনের সম্বন্ধ নয়; চাকর-মনিব ভাবই যে ছিল না। এতকাল বড়বাড়ীতে কাটিয়ে এই বুড়ো বয়সে এমন করে ছেড়ে এলাম; তাই মনটা কেমন হয়েছিল। কিন্তু সে ভাব বেশীক্ষণ থাকতে দিই নি; সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্যামপুরের নিতাই কুণ্ডু আমাকে যে সব কথা ব'লে গেল, তাই শুনে একদিকে মনে যেমন আনন্দ হ'ল, আবার অন্যদিকে তেমনই কষ্ট হোলো। বাবা তারক, আমার এই শরীরের রক্ত জল ক'রে বড়বাড়ীর এত বড় বিষয়, এত নাম-ডাক করিয়েছিলাম। তার কি এই

পরিণাম? তুমি গোরাচাঁদ দাদার ছেলের মত কথা বলেছ। এমন কথা কেউ বল্‌তে পারে না—এ কলিকালে ত এমন স্বার্থত্যাগ দেখি নাই—শুনিও নাই। তাই মনটা আবার কেমন হয়ে গেল। এই একটু আগে মালা নিয়ে বসেছি। কিন্তু মন স্থির কর্‌তে পারছিলাম না। এক একবার ইচ্ছা হচ্ছিল, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে আসি; আবার ভাবছিলাম, গিয়ে কাজ নেই, কার্ত্তিকের যে রকম মেজাজ হয়েছে, হয় ত অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারে। যাক্ সে কথা। নিতাই ত সব কথা ব'লে গেল; তার কথায় যা বুঝতে পারলাম, তাতে ও-টাকাটা শোধ করবার জন্য তোমাকে তাড়াতাড়ি না করলেও চল্‌বে; নিতাই তোমার কাছ থেকে এক পয়সা সুদও নেবে না। এমন কি সে এ কথাও বলে গেল যে, তুমি আসল টাকার যা দিয়ে সন্তুষ্ট হবে, তাই নিয়েই সে হাতচিঠা শোধ করে দেবে। বুঝেছ বাবা, যে নিতাই কুণ্ডু কোন দিন কারও কাছে একটা আধলা সুদ ছাড়ে নাই, সে আজ তোমার সম্বন্ধে কি ব'লে গেল! এরই থেকে বুঝে ফেল বাবা, ধর্ম্মপথে থাক্‌লে ভগবান্ সহায় হন। তিনি পাপের দণ্ডও দেন, পুণ্যের পুরস্কারও দেন। আজ তুমি যে মহত্ত্ব দেখিয়েছ, চির-দিন তাই দেখিও; তোমার কোন দিন অকল্যাণ হবে না।"

তারক কর মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "কাকা, নিতাই আমার অবস্থা দেখে-শুনে দয়াপরবশ হয়ে ও সকল কথা বলে গিয়েছে; কিন্তু তাকে ত আমি ব'লে

দিয়েছি, যেমন ক'রে হোক, পনর দিনের মধ্যে তার টাকা আমি শোধ করে দেব। সেই সম্বন্ধে উপদেশ নিতেই আপনার কাছে এসেছি। এখন কি কর্ত্তব্য, তাই বলুন।"

কর মহাশয় বলিলেন "বাবা, তুমি ত বিষয়ী লোকের মত কোন কাজ কর নাই; সুতরাং আমার মত বিষয়ী লোকের পরামর্শ ত তোমার মনের মত হবে না। বল দেখি, কে এক কথায় ত্রিশহাজার টাকার ঋণ স্কন্ধে নেয়? তুমি ত জান যে, নিতাই নালিশ করলে সমস্ত বিষয়ের উপরই ডিক্রী হোতো; এ টাকার জন্য তুমি একলা দায়ী হ'তে না। জেনে-শুনেও যখন তুমি এতগুলি টাকা নিজে দিতে স্বীকার করেছ, তখন তোমার পথ ত খোলাই রয়েছে। শোন বাবা, এই যে টাকার কথা উঠেচে, এটা সবে আরম্ভ; ইহার পর প্রতি কথায়, প্রত্যেক খুটিনাটি নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হবে, তা আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি কিছুতেই সে বিবাদের হাত এড়াতে পারবে না। হয় ত শেষে এমনও হ'তে পারে যে, পুনঃ-পুনঃ বিপন্ন হ'য়ে তোমারও মাথা বিগ্‌ড়ে যেতে পারে;—আর মানুষের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। তখন মামলা-মোকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সবই হ'তে পারে।"

তারক বলিলেন "ছোট-বৌমাও সেই কথাই আজ বল্‌ছিলেন।"

কর মহাশয় বলিলেন "বল্‌বেন না! ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়, কেমন জমিদার-বংশে ওঁর জন্ম! অদৃষ্টে সুখ নেই,

কি হবে। নহলে ঘরের মত ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে এসেছিলাম। আজ যদি সুরেন্দ্র বেঁচে থাক্‌ত, তা হ'লে কি এমন হয়? যাক্ সে কথা। ছোট-বৌমা কি বল্‌লেন?"

তারক বলিলেন "ছোট-বৌমা বল্লেন, এই টাকাতেই গোল মিট্‌বে না; একটার পর একটা গোল বেধে উঠ্‌বে। তিনি বলেন, আমার অংশ বেচে ধার শোধ দিয়ে, আমরা মনোহরপুরের সম্বন্ধ লোপ করে চলে যাই। হাঁ কাকা, এতকাল পরে কি, ভিখারীর বেশে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে—দুটা অন্নের জন্য স্ত্রী কন্যার হাত ধরে পরের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে! ছোট-বৌমা যখন এই কথা বলেছিলেন, তখন আমি ইহাই কর্ত্তব্য বলে স্থির করেছিলাম। কিন্তু কাকা, কেমন দুর্ব্বল মন, তারপর থেকে শুধুই মনে উঠ্‌ছে, আমাকে যথা-সর্ব্বস্ব ছেড়ে এই মনোহরপুর থেকে চলে যেতে হবে! এই বড়বাড়ীর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না। তাই আপনার কাছে এলাম কাকা! আপনি সদুপদেশ দিন। তবে আমার একটী প্রতিজ্ঞা এই যে, দাদার সঙ্গে আমি কিছুতেই বিরোধ করতে পারব না—কিছুতেই না। তার জন্য যদি আমার সব যায়, সেও স্বীকার।"

কর মহাশয় বলিলেন "বাবা তারক, যে রকম অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাতে এ গোল আর মেটে না। বিশেষ, মাধব যখন পরামর্শদাতা হয়েছে, তখন কিছুতেই মঙ্গল নেই। বিষয় বিক্রয়—সে কথা বল্‌তেও যে আমার কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু, তাও বলি, এ বিষয় তোমরা রক্ষা করতে পারবে না। ছোট-বৌমা ঠিকই বলেছেন, এ আগুন ক্রমেই জ্বলে উঠ্‌বে।"

তারক বলিলেন "তা হ'লে আপনি কি বলেন ?"

একজন লোক কিছুক্ষণ হইল প্রাঙ্গণে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। লোকটা যে কখন আসিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই, বারান্দায় আলো ছিল না। লোকটা এতক্ষণ উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। অবশেষে তারক যখন বলিলেন "তা হ'লে আপনি কি বলেন ?" তখন লোকটা আর একটু অগ্রসর হইয়া বারান্দার নিকট আসিয়া বলিল "তারকদা, আমারও কিছু বল্‌বার আছে।"

এ কণ্ঠস্বর যে বড়ই পরিচিত ! তারক ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন, বারান্দার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া লোকটা কথা বলিল। তারক বলিলেন "কে তুমি চিন্‌তে পেরেছি, মহেন্দ্র, ভাই !" এই বলিয়াই তিনি এক লম্ফে বারান্দা হইতে নীচে নামিয়া মহেন্দ্রকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন।

কিছুক্ষণ কেহই কথা বলিতে পারিলেন না। কর মহাশয় বারান্দা হইতে বলিলেন "তারক, মহেন্দ্রকে নিয়ে উপরে উঠে এস। মহেন্দ্র, তুমি কখন এলে ?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া মহেন্দ্র তারককে ধরিয়া লইয়া বারান্দায় উঠিলেন এবং কর মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন "কাকা মশাই, আমি সন্ধ্যার সময় এসেছি।"

তারক বলিলেন "ভাই, তুমি সন্ধ্যার সময় এসেছ? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

মহেন্দ্র বলিলেন "আমি সন্ধ্যার সময় এসেই পোষ্টমাষ্টার বাবুর ওখানে বসেছিলাম। তোমাদের সব কথা শুন্‌তে-শুন্‌তেই বিলম্ব হয়ে গেল। তারপর বাড়ীর দিকে আস্‌তেই হরির সঙ্গে দেখা হ'ল; সে বল্‌লে তুমি কাকার বাড়ীতে রয়েছ। তাই এখানে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তোমাদের কথা শুন্‌ছিলাম।"

কর মহাশয় বলিলেন "তা হ'লে তুমি এখনও বাড়ীতে যাও নাই; কারও সঙ্গে দেখাও কর নাই; হাতেমুখে জলও দেও নাই। ওরে হরি, মহেন্দ্র এসেছে। বাড়ীর মধ্যে বল, একটু জলখাবার তৈরি করে শীগ্‌গির দেয়। মহেন্দ্র, তুমি হাতে-মুখে জল দেও, ঠাণ্ডা হও, তারপর সব কথা শুনো। তুমি যে এ সময় এসেছ, বড়ই ভাল হয়েছে। তারক, এই দেখ ভগবানের লীলা। তুমি বড়ই একেলা মনে করছিলে; ভগবান্ তোমাকে এমন লোক মিলিয়ে দিলেন, যার চাইতে আপনার লোক আর তোমার নেই।"

তারক বলিলেন "ভাই মহেন্দ্র, তোমাকে আর কি বল্‌ব। আমি বড়ই বিপদে পড়েছি; তুমি ত সব কথা শোন নি।"

মহেন্দ্র বলিলেন "সব কথা শুনিনি বটে, কিন্তু যা শুনেছি, তেমন কথা আর কোন দিন শুনি নাই—আর যে শুন্‌ব তাও ত মনে হয় না। তারকদা, তুমি সত্যসত্যই দেবতা; তোমার

মত মানুষ ত আমি দেখি নাই। দেখ, আমি যে আর এখানে আস্‌ব, সে ইচ্ছাই আমার ছিল না; সুরেন্দ্রের সঙ্গেই আমার সব বিসর্জ্জন হয়ে গিয়েছিল। তবুও মধ্যে মধ্যে তোমার কথা মনে হোতো। আজ তিন দিন হোলো আমার যে কি হয়েছিল, তা আমিই বুঝতে পার্‌ছিনে। দিনরাত কে যেন আমাকে ক্রমাগত বল্‌ত যে, তুমি কি করছ; ছুটে যাও মনোহরপুরে। বিলম্ব কোরো না। কেন মনোহরপুরে আস্‌ব, তা আমি ভেবেই পাই নাই। কিন্তু যখন-তখনই ঐ এক কথা—ছুটে যাও মনোহরপুরে। কল্‌কাতার এত লোকজন, এত কোলাহলের মধ্যেও আমি ঐ কথাই শুন্‌তে লাগ্‌লাম। এমন ত আমার কখন হয় নাই। শেষে সত্যসত্যই আমার ভয় হোলো; আমার তখন মনে হোলো তোমাদের নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে। তখন আর আমি স্থির থাক্‌তে পারলাম না। মনোহরপুরে আস্‌ব ব'লে বেরিয়ে পড়লাম। তোমাদের এই ঘাটে এসে যখন আমার নৌকা লাগ্‌ল, তখন নেমে আমি যেন আর পথ চল্‌তে পারি না; আমার কেমন যেন ভয় কর্‌তে লাগল। তাই সুমুখেই ডাকঘর দেখে, সেখানে বসে পোষ্টমাষ্টার বাবুর কাছে তোমাদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি যা-যা জান্‌তেন, সব বল্‌লেন। নিতাই কুণ্ডুর সঙ্গে তোমার যে সব কথা আজ বিকেলে হয়েছে, তাই শুনে আমি আর সেখানে বসে থাক্‌তে পারলাম না; তখনই দৌড়ে এসে দাদা, তোমার পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছা হোলো।"

কর মহাশয় বলিলেন "থাক্ সে কথা এখন। তুমি হাতে-মুখে জল দিয়ে কিছু খাও।"

তারক বলিলেন "মহেন্দ্র, এমন করে, আমাকে না বলে চলে যাওয়া তোমার ভাল হয়নি ভাই! আমি যে কি কষ্টে পড়েছিলাম, তা আর তোমাকে কি বলব; তখন তোমার কথাই যখন-তখন মনে হোতো। কত চেষ্টা করে দাদাকে মামলার দায় থেকে উদ্ধার করা গেল। তারপর মনে করলাম্ থাক্ এখন কিছুদিন বিশ্রাম করি। কিন্তু ভগবান্ আমার অদৃষ্টে আরও দুঃখ লিখেছেন; তাই এখন আমি পথের ভিখারী হ'তে যাচ্ছি।"

এই সময় মহেন্দ্রের জন্য জলখাবার আসিল। কর মহাশয়ের অনুরোধে বাধ্য হইয়া মহেন্দ্র হাতেমুখে জল দিয়া জলযোগ করিতে বসিলেন। তখন কর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "মহেন্দ্র, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কি করছ এখন? শুনেছি, তুমি কোন সংবাদই এখানে দেও নাই।"

মহেন্দ্র বলিল "দিন কয়েক এদিক ওদিক নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম; কিন্তু কিছুতেই মন স্থির হোলো না। শেষে কলিকাতায় এলে এক বন্ধু বললেন যে, কাজকর্ম্ম নিয়ে থাক্‌লে আমার মন ভাল হবে। তাই কলিকাতায় একটা চাকুরী নিয়েছি। একটা সওদাগরের আফিসে কাজ করি; তাঁরা খুব ভালবাসেন, আশী টাকা মাইনে পাই। ছোট একটা বাড়ী ভাড়া করে, সেইখানেই পড়ে থাকি, আর কাজকর্ম্ম করি।"

কর মহাশয় বলিলেন "বেশ করেছ! এই ত চাই। তোমার ভাল হবে মহেন্দ্র! আমি বলে রাখ্ছি, তোমার ভাল হবে।"

মহেন্দ্র বলিলেন "আর ভাল কাকা! যাদের নিয়ে আমার ভাল, তাদের এই ত অবস্থা দেখ্ছেন।" মহেন্দ্র জলযোগ শেষ করিয়া তারকের নিকট আসিয়া বসিলেন।

তখন কর মহাশয় বলিলেন "এখন বল ত, কি করা কর্ত্তব্য?" মহেন্দ্র বলিলেন "আপনি থাক্তে আমরা আর কি বল্ব? আমি এই বলতে পারি যে, তারক দাদাকে আমি এখানে কিছুতেই থাক্তে দিচ্ছি নে। আমি সাত দিনের ছুটী নিয়ে এসেছি, এই সাত দিন পরে ওঁকে নিয়ে আমি কলিকাতায় যাব।"

কর মহাশয় বলিলেন "সে অতি উত্তম কথা। তারকের যে প্রকার মনের অবস্থা, তাতে সে যদি দিনকয়েক বাইরে থেকে আসে, তা হ'লে তার মনও ভাল হবে, শরীরও ভাল হবে। কিন্তু এ দিকের কি?" এই বলিয়া তিনি সুরেন্দ্রের স্ত্রী যে-যে কথা বলিয়াছিল, সে সমস্তই বলিলেন মহেন্দ্র এ সকল কথা ত আর পোষ্টমাষ্টারের নিকট শুনিতে পান নাই। এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র অত্যন্ত হৃষ্টভাবে বলিয়া উঠিলেন "ছোটবৌ এই কথা বলেছেন? হ্যাঁ তারক দাদা, তিনি এই কথা বলেছেন? তা হ'লে ত ঠিকই হয়েছে। তোমার মত কাজ তুমি করেছ তারক দাদা! আর ছোট-বৌমার মত কথা তিনি বলেছেন। আজ

সুরেন্দ্র বেঁচে থাক্‌লে, সেও বোধ হয়, এমন কথা বল্‌তে পারত না। তাই হোক কাকা, এ জমিদারীর অংশ এখনই বেচে ফেলা হোক্। গোলমাল যখন লেগেছে, মনান্তর যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন শীঘ্র শেষ হবে না। এ অবস্থায় তারক দাদার একেবারে স'রে দাঁড়ানই উচিত। তবে, আমি যখন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন তারক দাদা দুঃখ করছিলেন যে, দেশত্যাগ কি ক'রে করেন। সে কথা আর ভাবলে চল্‌বে না। ঐ সময় তাঁকে স'রে দাঁড়াতেই হবে। বিষয়ের অংশ থাক্‌লে তিনি ত আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারবেন না। আর কেহ হ'লে আমি বলতাম যে, নিজের ন্যায্য অংশ ছাড়বে কেন? কিন্তু উনি যখন তা করবেন না, উনি যখন সমস্ত দেনার দায়িত্ব এক কথায় স্কন্ধে নিলেন, তখন বিষয় বিক্রয় করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এখানে থাক্‌তে গেলেই বিবাদ করতে হবে, মামলা করতে হবে।"

তারক বলিলেন "দেখ মহেন্দ্র, দাদা যাই করুন না কেন, আমি কোন দিন তাঁর বিরুদ্ধে কিছু কর্‌ব না, তাতে যদি বিষয় যায়, যাবে। একটু আগেই আমার ভাবনা হয়েছিল যে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াব। শ্বশুরবাড়ী ত আমি যেতে পারব না; কাজেই আমাকে পথে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু, এখন তুমি এসেছ, এখন আর আমার কোন ভয় নেই—কোন ভাবনা নেই। কাকা, বিষয় বিক্রয় করাই স্থির। আপনি সেই অনুমতিই করুন।"

কর মহাশয় বলিলেন "তারক, তুমি যত সহজে কথাটা বললে আমি যে বাবা তত সহজে কথাটা বলতে পারছিনে। বড়বাড়ীর মানসম্ভ্রম যে আমার হাতে-গড়া; আমি যে তোমাদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য জীবনপাত করেছি। সেই চাঁদের হাট ভাঙ্গতে বলতে যে আমার মুখে বেধে আসছে। কিন্তু যে রকম দেখছি, আর তারকের যে রকম মনের ইচ্ছা, তাতে তোমরা যা বলছ, তা ছাড়া আর ত পথও নেই। কিন্তু এই ভাগের জমিদারী কিনে বিবাদ কিনতে কে আসবে? তারপর দেখ, সমস্ত বিষয়ের অর্দ্ধেকের মালিক হচ্চে কার্ত্তিক; আর যে অর্দ্ধেক, তারই অর্দ্ধেকের অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের সিকি অংশের মালিক তারক; ছোট বৌমার অংশ ত তিনি দান-বিক্রয় করতে পারবেন না, তাঁর জীবনস্বত্ব মাত্র। এখন এই সিকি অংশ কিনে নিয়ে কার্ত্তিক মিত্রের সঙ্গে দিনরাত লাঠালাঠি করতে কে যাবে?"

মহেন্দ্র বলিলেন "এক কাজ করা যাক্ না, বড়দাকেই তারক দাদার অংশ কিনবার জন্য অনুরোধ করা যাক্ না কেন? তিনি নিশ্চয়ই এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন।"

কর মহাশয় বলিলেন "সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; তবে অন্যের নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব করবার পূর্ব্বে তাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য; সে যদি উচিত মূল্যে কিনে নিতে চায়, তা হলে ত ভালই হয়; সংসারটা বজায় থাকবার একটা সম্ভাবনা হয়, —যদিও তা হবে না।"

মহেন্দ্র বলিলেন "মনে করুন, বড়দা যদি কিন্‌তে রাজী না হন, তা হ'লে কি করা যাবে ?"

কর মহাশয় বলিলেন "তা হ'লে যিনি কিন্‌তে চাইবেন, যিনি উপযুক্ত মূল্য দেবেন, তাঁর কাছেই বেচে ফেলবে। কিন্তু এ কথাও বলছি, তারক যা করেছ, এ ভূভারতে এমন কেউ কখন করে নাই ; এমন করে নিজের স্বত্ব কেউ কখন ছাড়তে পারে না।"

তারক বলিলেন, "তবে কাকা আমার অংশ বিক্রয় করা আপনার মত ?"

কর মহাশয় বলিলেন "তারক, অমন কথা এই বুড়োর মুখ থেকে আদায় করো না বাবা! তোমরা যা বোঝ ভাল, তাই কর গে। এখন তোমরা বাড়ী যাও। মহেন্দ্র, প্রস্তাবটা কা'ল তুমিই কার্ত্তিকের কাছে করে দেখো। তার পর সে কি বলে, আমাকে ব'লে যেও।"

তারক ও মহেন্দ্র তখন কর মহাশয়ের বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

[২১]

বাড়ীতে আসিয়া মহেন্দ্রের আর বিলম্ব সহিল না ; তিনি তারককে বলিলেন "তারকদা, কথাটা এই রাত্রিতেই বড়দার নিকট উপস্থিত করা যাক্।"

তারক বলিলেন "আজ রাত্রেই ? এত তাড়াতাড়ি কি ?

তুমি আজ ক্লান্ত হয়েছ, তার পর এই সব কথা শুনে তোমার মনটাও ভাল নেই। আজ রাত্রিটা বিশ্রাম কর; কা'ল সকালে যা হয় কোরো।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "বড়দার সঙ্গে ত রাত্রিতেই দেখা করা উচিত। নইলে তিনি হয়ত মনে করবেন যে, আমি তাঁকে তুচ্ছ করলাম।"

তারক বলিলেন "সে কথা ঠিক; তাঁর সঙ্গে এখনই তোমার দেখা করা উচিত। দেখ' মহেন্দ্র, এই কথাটী খুব মনে রেখ যে, দাদার সঙ্গে আমরা কোন প্রকার অসদ্ভাব করব না; তাঁকে একটা উঁচু কথাও বল্‌তে পারব না।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "তা কি আর বুঝি নাই তারকদা! নইলে এক কথাতে তুমি ত্রিশ হাজার টাকার ঋণ স্কন্ধে কর। তোমার কোন ভয় নাই। তুমি ত জান, আমি কখনও কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি নাই; বিশেষ তোমার এই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত যখন আমার মনে রয়েছে, তখন আমি কিছুতেই আত্মবিস্মৃত হব না। বড়দা যদি ওসব কথা মোটেই না তোলেন তা হ'লে আজ আমিও আপনা হ'তে কিছুই বল্‌ব না; কিন্তু তিনি যদি কথাটা তোলেন, তখন সব কথাই আমাকে বল্‌তে হবে।"

তারক বলিলেন "কিন্তু সাবধান ভাই, কোন রকমে যেন কোন অন্যায় কথা তোমার মুখ দিয়ে না বেরিয়ে পড়ে!"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তারকদা, তোমার এক-শ

বছর আগে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল; আর জমিদারের ঘরে না জন্মে তোমার কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে যাওয়া ঠিক হোতো।” এই বলিয়াই মহেন্দ্র কার্ত্তিকের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার শয়নঘরের সম্মুখে যাইয়া ডাকিলেন “বড়দা, ঘরে আছেন?”

কার্ত্তিক তখনও শয়নগৃহে আসেন নাই; বড়বধূ ঘরে ছিলেন। তিনি মহেন্দ্রের আগমন-সংবাদ শুনিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিলেন “কি ঠাকুরপো, তুমি কখন এলে? ভাল ত? আচ্ছা মানুষ যা হোক। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ যে ডুব দিলে, আর খোঁজখবর নেই!”

মহেন্দ্র বড়বধূকে প্রণাম করিয়া বলিলেন “বড়বৌদি, আপনাদের চরণ ছেড়ে কি থাক্‌বার যো আছে? তাই নানা জায়গা ঘুরে ক্লান্ত হয়ে, আবার ঐ চরণের ছায়াতেই এলাম। বড়দা কোথায় বড়বৌদি?”

বড়বধূ বলিলেন “তিনি এখনও কাছারী-ঘরেই আছেন। দেখ ঠাকুরপো, আমি ত তাঁকে কিছু বল্‌তে সাহস পাইনে। তুমি নিশ্চয়ই সব শুনেছ; তুমি যদি তাঁকে বুঝিয়ে ফেরাতে পার, তবে ভাল হয়। দেখ দেখি, সামান্য একটা কথা নিয়ে কি সব হচ্চে! তুমি বড় সময়ে এসেছ, ঠাকুরপো! তোমার কথা তিনি ঠেল্‌তে পারবেন না। আমি ত একেবারে লজ্জায় মরে আছি। কারও সঙ্গে কথাটী পর্য্যন্ত বল্‌তে পারছিনে। কি বল্‌ব বল?”

মহেন্দ্র বলিলেন “আমি যখন এসে পড়েছি বড়বৌদি, তখন আপনি কিছু ভাববেন না; যাতে সব দিক্ বজায় থাকে, তা আমি করব।”

বড়বধূ বলিলেন “তাই কর ভাই—তাই কর। ঠাকুরপো আমার বড় ভালমানুষ; সে এই কয়দিন স্বধু কেঁদেই আকুল হচ্চে; মেজবৌও তেমনি। সেও দিনরাত কাঁদছে। আমি লজ্জায় একেবারে মরে গেলাম। লোকে বলে বৌয়ে-বৌয়ে ঝগড়া করে সংসার ডুবিয়ে দেয়। আমাদের ত তা নয় ঠাকুরপো! আমাদের এ যে উল্‌টো হ'তে গেল। আমি কি করব বল? তুমি ত জান, আমি বড়বৌ হয়েও ছোটই আছি; কোন দিন সাহস ক'রে তোমার বড়-দাদাকে একটা কথাও বল্‌তে পারি নাই। এখন আমি কি করব?”

মহেন্দ্র বলিলেন “বড়বৌদি, আপনি লজ্জা করছেন কেন? সকলেই জানে যে, আপনি কিছুর মধ্যেই নেই—তারকদাও তা জানেন, মেজবৌদিও তা জানেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না।”

বড়বধূ তখন মহেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন “ঠাকুরপো, তোমাকে আমরা পর মনে করি না। আমার কাছে যেমন মেজঠাকুরপো, যেমন ছোটঠাকুরপো ছিলেন, তুমিও তেমনি। তুমি এই বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাও। এ আগুন নিবিয়ে দেও ভাই! তোমাকে বল্‌ছি,

উনি ভুল বুঝেছেন, মেজঠাকুরপোর মত মানুষ মাটী দিয়ে গড়ালেও হয় না। ওঁর ভুল ভেঙ্গে দেও। তুমি ত জান, উনি ভাই-অন্ত-প্রাণ ছিলেন। ঐ ঠাকুরটাই আমাদের সর্ব্বনাশ করলে। তুমি ওর হাত থেকে তোমার বড়দাদাকে বাঁচাও; নইলে সব যায় ভাই, আমাদের সব যায়!"

মহেন্দ্র বলিলেন "বড়বৌদি, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি বড়দার কাছে এখনই যাচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া কাছারীঘরের দিকে গেলেন।

কাছারীর বারান্দায় অন্ধকারে বসিয়া তখনও কার্ত্তিক ও মাধবঠাকুর কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে একটা লণ্ঠন ধরিয়া একটী চাকর যখন মহেন্দ্রকে লইয়া আসিতে লাগিল, তখন উভয়েই বিস্মিত হইলেন। কে আসিতেছে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না।

মহেন্দ্র বারান্দায় উঠিয়াই "বড়দা, আমি এসেছি" বলিয়া কার্ত্তিককে প্রণাম করিলেন। কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন "মহেন্দ্র যে, কখন এলে? ভাল ত? বোস বোস, শুনি।"

মহেন্দ্র বলিলেন "এই একটু আগেই এসেছি।"

কার্ত্তিক বলিলেন "তবুও যা হোক, তুমি এসেছ; সেই যে কাউকে না ব'লে কোথায় চলে গেলে, তার পর আর উদ্দেশ নেই। আমরা আর ভেবে বাঁচিনে। খবরের কাগজে পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। তার পর, তোমার শরীর

কেমন আছে? এতদিন কোথায় ছিলে? তুমি যে দাঁড়িয়েই রইলে! বোস।" এই বলিয়া তিনি মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া বেঞ্চের উপর নিজের পার্শ্বে বসাইলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন "থাক্‌বার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, বড়দা! নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। শেষে কিছুই ভাল লাগল না; তাই আবার ফিরে এলাম।"

কার্ত্তিক বলিলেন "আমি মনে করছিলাম, তুমি বুঝি সংবাদ পেয়ে এসেছ।"

মহেন্দ্র বলিলেন "না বড়দা, আমি কোন সংবাদ পাই নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন "তা হলে বাড়ী এসে সব শুনেছ?" মহেন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন।

কার্ত্তিক মহেন্দ্রকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "তা এক পক্ষের কথা শুনে তুমি কিছু সিদ্ধান্ত করো না; আমার কথাগুলোও শোন।"

মহেন্দ্র বিনীতভাবে বলিলেন "বড়দা, আমি আপনাদের ছোট ভাই; আপনাদের কাছ থেকে অনেক অনুগ্রহ পেয়েছি। আমি পক্ষাপক্ষ মোটেই বুঝি নে, আর সব কথা শুনে একটা বিচার করবার ধৃষ্টতাও আমার থাকা উচিত নয়। আমি একটা নিবেদন জানাতে এসেছি। আপনি আমাদের যেমন বড়দা তেমনই আছেন। তারক-দা'র প্রতিজ্ঞা, তিনি আপনার অসন্তোষভাজন কিছুতেই হবেন না; আপনি যা

আদেশ করবেন, তিনি তাই মাথা পেতে নেবেন; আপনি যা বলবেন, তিনি তাই করবেন।”

কার্ত্তিক বলিলেন “আমি আর কি বলবো? আমার বলবার কিছুই নাই। সে যা করেছে, তা কেউ করে না।”

মহেন্দ্র বলিলেন, “সে কথা ত আমি জিজ্ঞাসা করছি নে বড়দা। আমি বলছি কি, আপনার কি আদেশ, তাই তিনি শুন্‌তে চাচ্ছেন,—তিনি তা প্রতিপালন করবেন।”

মাধব ঠাকুর এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল; এইবার সে কথা বলিল “বড়বাবু আবার কি আদেশ করবেন? তিনি কোথা-কার কে?”

মহেন্দ্র উগ্রস্বরে বলিলেন “আপনার সঙ্গে ত আমি কথা বল্‌ছি নে মহাশয়! আপনি কেন আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন?”

মাধব ঠাকুর উত্তেজিতভাবে বলিলেন “তুমি কে হে? তোমার যে বড় কড়া মেজাজ দেখছি।”

মহেন্দ্র বলিলেন “আমি ত আপনাকে কোন চড়া কথা বলি নাই; আপনাকে সুধু চুপ করে থাকতে বলেছি।”

মাধব আরও রাগিয়া বলিল “কেন আমি চুপ করে থাকব? উচিত কথা বলব, তাতে আমি কাউকে ডরাই না।”

মহেন্দ্র তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কার্ত্তিককে বলিলেন “বড়দা, আমি একটা কথা বলতে চাই।”

কার্ত্তিক বলিলেন “কি তোমার কথা মহেন্দ্র?”

মহেন্দ্র বলিলেন "আমি বলি এই যে, আপনি তারক দাদার বিষয়সম্পত্তির অংশ কিনে নিন; তিনি বাড়ী থেকে বাহির হয়ে যান। তা হ'লে ত আর কোন গোলই থাকে না; বড়বাড়ীর মানসম্ভ্রম খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবই বজায় থাকে।"

কার্ত্তিক বলিলেন "কি বল্‌লে? তোমার কথা আমি বুঝতে পারলাম না।"

মহেন্দ্র বলিলেন "কথাটা ত তেমন শক্ত নয় বড়দা! আপনাদের সম্পত্তিতে তারকদার যে অংশ আছে, তা তিনি আপনার কাছে বিক্রয় করতে চান।"

কার্ত্তিক বলিলেন "আমার কাছে বিক্রয়! কেন সে বেচতে চায়?"

মহেন্দ্র বলিলেন "তিনি বলেন, তা হ'লে তিনি আপনার ছোট ভাই হয়েই থাক্‌তে পারেন।"

মাধব ঠাকুরের লজ্জা বলিয়া কিছু নাই; সে বলিল "বিষয় বিক্রয় করলে মেজবাবুর চল্‌বে কি করে, তা ভেবেছেন?"

মহেন্দ্র বলিলেন "এই দশ দুয়ারে ভিক্ষা করে তাঁর চল্‌বে। সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনার দুয়ারে তিনি ভিক্ষা চাইতে যাবেন না; তাঁর বড়দা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন তাঁকে ভিক্ষাও কর্‌তে হবে না; দরিদ্র ছোট ভাইকে বড়দা দুটো খেতে দিতে পারবেন।"

কাৰ্ত্তিক বলিলেন “মহেন্দ্র, সে আর হয় না। তোমার প্রস্তাব কোন কাজের কথাই নয়। আমি তার বিষয় কিনব কেন?”

মহেন্দ্র বলিলেন “তাঁকে বিষয় বেচতেই হবে, নইলে ধার-শোধের অন্য উপায় নাই। আপনি কিনলে সব রক্ষা হয়; তাই তিনি এই প্রস্তাব করছেন।”

কাৰ্ত্তিক কথাটা উল্‌টা বুঝিলেন; এ সময় তাঁহার পক্ষে উল্‌টা বোঝাই স্বাভাবিক। তিনি কুপিত হইয়া বলিলেন “মহেন্দ্র, তুমি ছেলেমানুষ, কথাটা বুঝতে পার নাই। এটা জমিদারী চাল। এটা আমাকে ভয় দেখান মাত্র। তুমি তাকে বোলো, তার এ কথায় আমি ভয় পাবার ছেলে নই। তার ইচ্ছা হয়, সে যাকে ইচ্ছা তাকে বিষয় বেচতে পারে। এমন মাথার উপর মাথা কার আছে যে, এই বিষয়ের অংশ কিনে তা দখল করতে পারে? বুঝেছ মাধব-দা, ও সব ভয় দেখাবার কথা। তাকে বোলো, কাৰ্ত্তিক মিত্তির ভয় পাবার ছেলে নয়।”

মহেন্দ্র বলিলেন “বড়দা, যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে একটা কথা বলি। আপনি এই প্রস্তাবটা যেভাবে গ্রহণ করলেন, তারকদা সে-ভাবে বলেন নাই। যাতে তাঁর ঋণ শোধ হয়, এদিকে বড়বাড়ীরও মান থাকে, এই ভেবেই তিনি আপনার কাছে এই প্রস্তাব করতে বলেছিলেন। আপনি ভাল ক'রে চিন্তা করে কথাটার উত্তর দেন, এই আমার প্রার্থনা।”

কার্ত্তিক তেমনই রুক্ষস্বরে বলিলেন "আমি অনেক ভেবেই কথা বলেছি। তার সাধ্য থাকে, আর সে যদি খরিদ্দার পায়, তা হ'লে সে যার কাছে ইচ্ছা তার অংশ বেচতে পারে। তারপর দেখে নেব, সে খরিদ্দার কেমন ?"

মহেন্দ্র বলিলেন "তা হ'লে আপনার কাছে কোন [illegible] নেই ?"

কার্ত্তিক বলিলেন "না, আমি বিষয়ের অংশ কিনব না; আর কে কিন্‌তে আসে, তাও দেখে নেব।"

মহেন্দ্র বলিলেন "তা হ'লে আমি আসি বড়দা!"

মাধব বিদ্রূপ করিয়া বলিল "মহেন্দ্র বাবু, খদ্দের জুটলে আমরা যেন জান্‌তে পাই।"

মহেন্দ্র সে কথার কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন অন্ধকারে বসিয়া দুইজনে নানা কথা হইল; সে সকল কথা অন্ধকারেই থাকুক; ভ্রাতৃবিরোধের সে বিষ আর ছড়াইয়া কাজ নাই।

পরদিন বেলা আটটার সময় দুইখানি খালি পাল্‌কী বড়বাড়ীর কাছারীর প্রাঙ্গণ পার হইয়া অন্দরের দ্বারের কাছে আসিল; আর দুইখানি পাল্‌কী কাছারীর পার্শ্বেই রাজপথের উপর রহিল। কার্ত্তিক তখন একাকী কাছারীর বারান্দায় বসিয়া ছিলেন।

একটু পরেই অন্দর হইতে সুপ্রভা, রঙ্গিনী ও স্বর্ণ আসিয়া

পাল্‌কীতে উঠিলেন। কার্ত্তিক বারান্দায় বসিয়া সমস্তই দেখিলেন; একটী কথাও বলিলেন না।

পাল্‌কী দুইখানি যখন কাছারীর প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া রাস্তায় গেল, তখন তারক ও মহেন্দ্র অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, কার্ত্তিক কাছারীর বারান্দায় বসিয়া আছেন। তারক অগ্রসর হইয়া, কোন কথা না বলিয়া কার্ত্তিককে প্রণাম করিয়া রাস্তার দিকে গেলেন। কার্ত্তিক নির্ব্বাক্। তাহার পর মহেন্দ্র আসিয়া কার্ত্তিককে প্রণাম করিয়া যখন দুই চারি পদ গিয়াছেন, তখন কার্ত্তিক ডাকিলেন "মহেন্দ্র!"

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "আজ্ঞা?"

"এ সকল কি?"

মহেন্দ্র অবিচলিতকণ্ঠে বলিলেন "মনোহরপুরের বড়বাড়ীর লক্ষ্মী চলিয়া গেলেন।" এই বলিয়াই মহেন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না। রাস্তার উপর যে দুইখানি পাল্‌কী ছিল, তাহাতে দুইজনে আরোহণ করিলেন। কার্ত্তিকের মুখ মলিন হইয়া গেল।

[২২]

মনোহরপুরে আর বাস করা সঙ্গত নয়, স্থির হওয়ায় আপাততঃ সকলে রাইগঞ্জে গেলেন। রঙ্গিনী সেখানে দুই তিন দিন থাকিয়াই পিত্রালয়ে গমন করিবেন। ব্যবস্থা

এই হইল যে, মহেন্দ্র কলিকাতায় যাইয়া ভাল দেখিয়া একটা বাড়ী ভাড়া করিবেন; তাহার পর সকলেই কলিকাতায় যাইবেন। কলিকাতায় মহেন্দ্রের যে বাসা ছিল, তাহাতে এতগুলি লোকের থাকিবার স্থান হইবে না মনে করিয়াই এই ব্যবস্থা হইল।

রাইগঞ্জে পৌছিয়াই সেই দিন অপরাহ্নকালে মহেন্দ্র ও তারক শ্যামপুরে নিতাই কুণ্ডুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কুণ্ডু মহাশয় পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

তারক বলিলেন "কুণ্ডু মশাই, আপনি যে আমার উপর এত অনুগ্রহ করবেন তাহা আমি ভাবি নাই। এখন আপনার কাছে একটা পরামর্শের জন্য আসিয়াছি।"

নিতাই কুণ্ডু বলিল "আমার সঙ্গে পরামর্শ! আমি কি পরামর্শ দিবার মত লোক? আপনারা দয়া করেন, এই আমার সৌভাগ্য।"

তারক বলিলেন "সে কথা থাক্ কুণ্ডু মশাই! আমি স্থির করেছি যে, আমার অংশের জমিদারী-তেজারতী বিক্রয় করিয়া আমি আপনার ঋণ শোধ করব। আমি আর জমিদারীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখব না; কারণ তা হ'লেই দাদার সঙ্গে গোলযোগ হ'তে পারে। দাদাকেই আমার অংশ কিনে নিতে বলেছিলাম; কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হন নাই; তিনি

লেছেন, আমি যার কাছে ইচ্ছা, জমিদারী বিক্রয় করতে
ারি। তাই আপনার কাছে আমরা এসেছি। আপনি কেন
ামার অংশ কিনে নিয়ে আমাকে ঋণদায় থেকে অব্যাহতি
দন না।"

নিতাই করযোড়ে বলিল "এমন আদেশ করবেন না
মজবাবু! মনোহরপুরের মিত্রদিগের জমিদারী আমি কিন্‌ব!
শেষ, কথা কি জানেন, আমি আর এখন কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাট
লবাসিনে; তাই কারবার তুলে দিয়ে, যে সামান্য কিছু
াছে, তাই নাড়াচাড়া করি; আমার কি জমিদারী করা
াজে, না পোষায়! আমার টাকার জন্য আপনি এত ব্যস্ত
চ্চেন কেন মেজবাবু? আমি ত ব'লেই এসেছি যে, আপনার
খন সুবিধা হবে, তখন টাকা দেবেন, আমি এক পয়সাও সুদ
াই নে। সুদ অনেকের কাছে খেয়েছি, এখনও খাচ্চি
মজবাবু, কিন্তু আপনার কাছে আমি সুদ নেব না। আপনারা
সেছেন, ভালই হয়েছে; আমার কথাটা মুখে-মুখে থাকা
কছু নয়, একটা লেখাপড়া থাকাই ভাল। আমি আপনার
স হাতচিঠাখানা পাল্‌টে দিতে চাই।"

তারক বলিলেন "না কুণ্ডু মশাই, তা আপনি করবেন না;
সদ ছাড়বেন কেন? কিন্তু কথা এই যে, আমার ভরসা
ঐ জমিদারী। দাদার এখন যে রকম মনের ভাব, তাতে
তিনি নানা গোল বাধাতে পারেন। আমি তাঁর সঙ্গে কোন
কম মনান্তর করতে চাইনে; এ অবস্থায় আমার অংশ

বিক্রয় করা ছাড়া আপনার ঋণশোধের যে অন্য কোন উপায় নাই।"

নিতাই কুণ্ডু বলিল "মেজবাবু, আমি মূর্খ মানুষ; কিছু মনে করবেন না; আপনি টাকা দিতে যাবেন কেন? আপনি চুপ করে থাকুন; আমি নালিস করে টাকা আদায় করে নিই; টাকাটা যে সরকারী দেনা, তা প্রমাণ করতে কিছুই বেগ পেতে হবে না;—আমি ত সবই জানি। আমার কথা যদি শোনেন, তা হ'লে আপনি কোন কথা বলবেন না; দেখুন আমি টাকা আদায় করতে পারি কি না।"

তারক বলিলেন "তা হয় না কুণ্ডু মশাই! আমি দাদার সঙ্গে বিরোধ করতে পারব না। আপনি ত বুঝতে পেরেছেন যে, দাদা মনে করেছেন, আমি টাকা সরিয়েছি। এর পরেও কি আর আমি এই টাকার জন্য দাদাকে দায়ী করতে পারি? আমি যথাসর্ব্বস্ব ছেড়ে দিলে হয় ত দাদার মনের সন্দেহ দূর হতে পারে; তাই আমি এই সঙ্কল্প করেছি।"

কুণ্ডু মহাশয় বলিলেন "মেজবাবু, সে কথা আর আমাকে বল্‌ছেন কেন! আমি সে সব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কথা কি জানেন, ঐ জমিদারীর অংশ কেনা, আর ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা কেনা, একই কথা। ঘরের টাকা খরচ ক'রে কে এ বিবাদ কিন্‌তে যাবে বলুন?"

তারক বলিলেন "সে কথা কি ভাবি নাই, কুণ্ডু মশাই! কিন্তু আমার টাকা শোধ করবার ঐ ত একমাত্র উপায়। এমন লোক কি কেহ নাই, যে আমার অংশ কিন্‌তে পারে।"

নিতাই কুণ্ডু বলিল "মেজবাবু, একজনরা পারে; হয় ত ব'লে পাঠালে এখনই নেচে উঠ্‌বে; কিন্তু সেটা কি ভাল হ'বে?"

মহেন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন; তিনি বলিলেন "এমন লোক কে?"

কুণ্ডু বলিল "মল্লিক বাবুরা যদি শুন্‌তে পান যে, আপনি তাঁদের কাছে আপনার অংশ বেচতে সম্মত আছেন, তা হ'লে তাঁরা এখনই নিতে পারেন।"

তারক বলিলেন "সে কিছুতেই হ'তে পারে না; তা হ'লে যে সব যাবে, কুণ্ডু মশাই!"

মহেন্দ্র বলিলেন "তারকদা, এইখানে তুমি ভুল কোরছ। তোমার অংশ যে কিন্‌বে, তারই সঙ্গে বড়দার গোলযোগ বেধে উঠ্‌বে; তা কুণ্ডু মশাই কেনেন, আর অন্য কেহই কেনেন। তোমার অংশ যাওয়ার অর্থই হচ্ছে বড়বাড়ীর জমিদারীর সর্ব্বনাশ; সে কেহই ঠেকাইতে পারিবে না, বিবাদ নিশ্চয় বাধিবে।"

তারক বলিলেন "তা হ'লে কি করা যায়। জেনে শুনে মল্লিকবাবুদের হাতে এ জমিদারী কেমন করে তুলে দিই।"

নিতাই কুণ্ডু বলিল "মেজবাবু, আপনারা আজ বাড়ী

যান। আমি দু-দশ স্থানে কথাটা পেড়ে দেখি; তারপর মনোহরপুরে আপনাকে সংবাদ দেব। টাকার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

তারক বলিলেন "কুণ্ডু মশাই, আমরা ত মনোহরপুরে নেই; আজ সকালে আমরা রাইগঞ্জে এসেছি; সেখান থেকেই এখানে এসেছি। আমি আর মনোহরপুরে যাব না।"

কুণ্ডু বলিল "তা হ'লে আপনি একেবারে মন স্থির ক'রে বেরিয়েছেন মেজ বাবু! রাইগঞ্জের চৌধুরী বাবু কি বল্‌লেন?"

তারক বলিলেন "অতুল আর কি বল্‌বে। সে দুঃখ করতে লাগ্‌ল। এত টাকা দিয়ে বিষয় কেনা ত তার পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। তার পর আমার স্ত্রীর যে অংশ আছে, তাতে আমি হাত দিতে পারিনে; নগদ টাকা যা আছে, তাতেও আমার অধিকার নেই। যে রকম অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, তাতে আমার স্ত্রী-কন্যার ঐ যা সম্বল! আর এক সম্বল এই মহেন্দ্র!"

কুণ্ডু বলিল "মহেন্দ্র বাবু ত আপনার ছোট ভাইয়ের মত। আপনার ভয় কি মেজ বাবু! আপনি কিছু ভাববেন না। আজ বাড়ী যান; আমি যা হয় একটা স্থির করে দুই এক দিনের মধ্যেই আপনাকে জানাব।"

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া তারক ও মহেন্দ্র নিতাই কুণ্ডুকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়া রাইগঞ্জে চলিয়া গেলেন।

এ দিকে কার্ত্তিক ও মাধব ঠাকুরও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তারক যে রাইগঞ্জে গেলেন, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়া-

ছিলেন। সেই দিনই অপরাহ্নকালে কার্ত্তিক তারকের গতি-বিধি অবগত হইবার জন্য গোপনে একজন লোককে রাইগঞ্জে পাঠাইয়াছিলেন। সে লোক রাত্রিতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, তারক ও মহেন্দ্র সেই দিনই শ্যামপুরে নিতাই কুণ্ডুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন এবং অনেকক্ষণ সেখানে ছিলেন। সে লোক আরও বলিল যে, নিতাই কুণ্ডুই তারকের অংশ কিনিবে, এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে।

সেই রাত্রিতেই মাধব ঠাকুরকে ডাকাইয়া আনিয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। স্থির হইল, পরদিন প্রাতঃকালেই উভয়ে শ্যামপুরে নিতাই কুণ্ডুর নিকট যাইবেন, এবং যে প্রকারে হউক তাহাকে বিষয়ের অংশ কিনিবার সঙ্কল্প হইতে বিরত করিবেন।

পরদিন বেলা প্রায় আটটার সময় কার্ত্তিক ও মাধব ঠাকুর শ্যামপুরে নিতাইয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ তাহার বাড়ীতে এই দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব দর্শনে নিতাই এই আগমনের কারণ বুঝিতে পারিল; মেজবাবু ও মহেন্দ্র যে পূর্ব্ব দিন তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, এই সংবাদ চরমুখে শুনিয়াই যে ইঁহাদের শুভাগমন হইয়াছে, এ অনুমান করিতে নিতাই কুণ্ডুর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তির বিলম্ব হইল না। সে সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিল।

কার্ত্তিক আসন গ্রহণ করিয়াই বলিলেন "কুণ্ডু মশাই, মেজবাবু যে গত কল্য তোমার এখানে এসেছিল, সে সংবাদ

আমি পেয়েছি। কি পরামর্শ হ'ল, তাই জান্‌বার জন্য তোমার কাছে এসেছি।"

নিতাই কুণ্ডু কার্ত্তিকের কথায় এবং কথা বলিবার ভঙ্গীতে বিরক্ত হইয়া বলিল "হাঁ বড়বাবু, তাঁরা কাল এসেছিলেন; কিন্তু কি কথা হোলো, তা জানবার আপনার কি কিছু প্রয়োজন আছে? আমার কাছে অনেকে অনেক প্রয়োজনে আসে, সে কথা কি আমার প্রকাশ করা উচিত?"

কার্ত্তিক বলিলেন "অন্যের গোপন কথা ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি নে কুণ্ডু! আমাদেরই কথা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

নিতাই বলিল "আপনার কথা ত বিশেষ কিছু হয় নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন "বিশেষ না হ'তে পারে, কিছু ত হয়েছে?"

নিতাই বলিল "যদি কিছু হ'য়েই থাকে, তাই বা অপরের কাছে বল্‌তে যাব কেন? এ আপনার অন্যায় অনুরোধ বড় বাবু!"

মাধব বলিল "কুণ্ডুর পো, তা হলে মেজ বাবুর সঙ্গে তোমার যে বন্দোবস্ত হয়েছে, তা তুমি বল্‌তে চাও না। কিন্তু সে সব কথা কি আর আমাদের কাছে গোপন আছে? বাতাসের আগে সব বৃত্তান্ত আমাদের কাছে গিয়েছে।"

নিতাই বলিল "সব যদি জেনে থাক ঠাকুর, তা হ'লে আর এ গরীবের কুঁড়েতে পায়ের ধূলো কেন?"

মাধব বলিল "কথাটা ভাল ক'রে জানা দরকার।"

নিতাই বলিল "কি আপনারা জান্‌তে চান, খুলেই বলুন না?"

কার্ত্তিক বলিলেন "মাধব, তুমি চুপ কর; আমি বল্‌ছি।. দেখ কুণ্ডু, তুমি যে মেজবাবুর অংশ কিনে টাকা শোধ করিয়ে নেবে, এ কথা শুনেছি। তাই তোমাকে এমন করতে নিষেধ করবার জন্য আমরা এসেছি।"

নিতাই বলিল "বেশ, আচ্ছা ধরে নিলাম যে, আমি মেজবাবুর অংশ কিনে নেব স্থির করেছি; কিন্তু আপনার কথায় আমি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করব কেন?"

মাধব ঠাকুর বলিল "কুণ্ডু, তুমি অনুগত লোক, তাই তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি, তুমি অমন কর্ম্মও কোরো না, করলে ভাল হবে না।"

নিতাই কুণ্ডু বলিল "শোন ঠাকুর, এই নিতাই কুণ্ডু কারও অনুগত নয়। এ তল্লাটে, বল্‌তে কি, অনেকেই নিতাই কুণ্ডুরই অনুগত; অনেকেই এই গরীবের ঘরে বাঁধা আছেন। তবে যে বল্‌ছ, 'ভাল হবে না', কি ভাল হবে না ঠাকুর? কথাটা খুলেই বল না। আমি চাষা মানুষ, তিলির ছেলে, টাকা পয়সার কথাই বুঝি, তোমাদের মত ভদ্রলোকের কথা বুঝে উঠ্‌তে পারি নে। কি ভালটা হবে না, খুলেই বল না।"

মাধব বলিল "খুলে আর কি বল্‌ব; ও অংশ কিন্‌লে এই শ্যামপুরে আর তোমার বাস করতে হবে না; বড় বাবুর সঙ্গে লাগলে তোমার ভিটেমাটী কিছুই থাক্‌বে না।"

নিতাই বলিল "ঠাকুর, বুড়ো হয়েছি, ও সব কথায় আমার আর এখন রাগ হয় না। তবে কথাটা যখন বল্‌লে, তখন বল্‌তেই হয় যে, এই নিতাই কুণ্ডু যদি হাতের গোড়ায় না থাকৃত তা হ'লে তোমার বড়বাবুকে এখন কোথায় থাক্‌তে হ'ত, জান? আরও একটা কথা বলি, যদি ঐ মেজবাবু অমন করে সমস্ত দেনা ঘাড়ে করে না নিতেন, যদি বড়বাবু অমন দেবতার মত ভাই না পেতেন, তা হ'লে আমি নিতাই কুণ্ডু, আমিই নালিশ করে সমস্ত বিষয় বিক্রয় করে নিতাম। মেজবাবুর জন্যেই পারছি নে; নইলে কার ভিটেমাটী থাকৃত না, তা দেখা যেত। যাক্, সে কথায় কাজ নেই; মেজ-বাবুই যখন এত সহ্য করছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সহ্য করবেন, তবুও বড়বাবুর সঙ্গে বিবাদ করবেন না, তখন আমি কেন মিছে কথা-কাটাকাটি করি।"

কার্ত্তিক রাগিয়া বলিলেন "নিতাই কুণ্ডু, তুমি কার সুমুখে কথা বল্‌ছ, তা মনে আছে?"

নিতাই হাসিয়া বলিল "মনে থাকৃবে না কেন বড়বাবু? সব মনে আছে; কিন্তু কি করব, মনে যা হচ্চে, তা ত করবার যো নেই, মেজবাবু যে মধ্যে আছেন।"

মাধব বলিল "কি মনে আছে, বলেই ফেল না গো!"

নিতাই বলিল "মনে হচ্চে যে, কালই এক নম্বর দাখিল করে দিয়ে, একবার বড়বাড়ীর উপর ঢোল বাজিয়ে আসি।

টাকা ধার আর কোথাও পেতে হবে না—কথাটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে।”

কার্ত্তিক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন “নিতাই বুঝে-সুঝে কথা বোলো, এখনও বল্‌ছি।”

নিতাই বলিল “বড়বাবু, এই বুড়ো বয়সে কি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করে একটা বদ্‌নাম কিনব।”

কার্ত্তিক বলিলেন “মাধব, ছোটলোকের স্পর্দ্ধা দেখেছ?”

নিতাই বলিল “বড়বাবু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এ আপনার মনোহরপুরের বড়বাড়ীর কাছারীঘর নয়; এ আমার বাড়ী! এখনও বল্‌ছি, জাত তুলে কথা বল্‌বেন না। আমি হয় ত সইতে পারি, কিন্তু ঐ দেখুন আমার ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একবার একটা কথা বল্‌লে আর এখান থেকে মান বাঁচিয়ে যেতে পারবেন না।”

কার্ত্তিক এতক্ষণ বসিয়া ছিলেন। নিতাইয়ের এই কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া বলিলেন “কোন্ শালা আমার অপমান করতে পারে? এত বড় কথা —আমাকে অপমান!”

নিতাই কুণ্ডু আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না; বলিল “শোন কার্ত্তিক মিত্তির! মনে করেছিলাম, তোমার বিষয় বাঁচিয়ে দেব; তারই চেষ্টা করছিলাম; কিন্তু তোমার মত লোকের উপযুক্ত সাজা হওয়াই দরকার। তুমি কেমন জমিদার, তোমার কেমন পয়সার জোর, তা একবার দেখে

নিতে হচ্চে। কটা টাকা তোমার ঘরে আছে? তোমাদের বিষয়ের অংশ কিছুতেই কিনব না, মনে করেছিলাম; কিন্তু তোমাকে শিখিয়ে দিতে হচ্চে। আজ যাকে তুমি শালা বলে গেলে, সেই নিতাই কুণ্ডুর—সেই তিলির ছেলের পা জড়িয়ে তোমাকে ধর্‌তে হবে—এ কথা ব'লে রাখছি। মেজবাবুর কোন উপরোধ, তাঁর চক্ষের জল আর আমি মানছি নে। তোমরা এখনই আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও, নইলে—” নিতাই আর বলিতে পারিল না। কিন্তু কথাটা অসম্পূর্ণ রহিল না, নিতাইয়ের পুত্র রাধাবল্লভ দৌড়িয়া সম্মুখে আসিয়া বলিল “নইলে চাকর দিয়ে ঘাড় ধরে বা'র করে দেব। বাবা সাম্‌নে না থাক্‌লে এতক্ষণ তা হয়ে যেত।”

মাধব ঠাকুর এই সব কথা শুনিয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল; কাপুরুষ লোকের দশাই এই রকম! মাধব বলিল “চল বড়বাবু, আর এখানে থেকে অপমান হয়ে কাজ নেই। যা তোমার মনে থাকে, তা বাড়ী গিয়ে করলেই হবে।”

কার্ত্তিক তখন রাগে কাঁপিতেছিলেন। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে তাঁহার কেহই নাই। তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন “নিতাই কুণ্ডু, এর শোধ যদি আমি দিতে না পারি, তবে আমি ফকিরচাঁদ মিত্রের ছেলেই নই।”

নিতাই বলিল “যাও যাও, ঘরে যাও। ফকিরচাঁদ মিত্রের ছেলে এমন ছোটলোক হয় না। আর কথা বাড়িও

না—যা ক্ষমতা থাকে, কোরো। কিন্তু শুনে যাও, তারক্ মিত্রের অংশ আমি কিন্‌ব; দেখি তোমরা কি করতে পার।"

কাত্তিক যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, মাধব তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাড়ীর বাহিরে লইয়া গেল।

তাঁহারা চলিয়া গেলে নিতাই কুণ্ডু পুত্র রাধাবল্লভকে বলিল "বাবা রাধাবল্লভ, বদ্ লোকের সঙ্গে থাক্‌লে, পাজী লোকের পরামর্শ শুন্‌লে ভদ্রলোক কেমন ছোটলোক হয়ে যায়, দেখ্‌লে ত! ঐ কার্ত্তিক মিত্তির অমন খারাপ লোক ছিল না; কা'ল ওর ভাই তারক বাবুকে যেমন দেখেছ, কার্ত্তিক মিত্তিরও তেমনই ছিল; দুই ভায়ে—দুই-ই বলি কেন—তিন ভাইয়ে হরিহর-আত্মা ছিল। ওরা যে জেঠতুতো খুড়তুতো ভাই, তা কেউ বুঝতে পারত না। এই মতিচ্ছন্ন হ'বে বলেই ছোট-ভাইটা সাপের হাতে প্রাণ দিল। কার্ত্তিক মিত্তির একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে। আর এই ভাইয়ের জন্য মেজবাবু কি না করলেন—এত বড় ঋণটা এক কথায় মাথা পেতে নিলেন; আর আজ যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করে, সেই ঋণ শোধ দিতে দাঁড়িয়েছেন। যাক্ সে কথা। বাবা, তুমি একটা কাজ কর ত। আমার জবানি একখানা চিঠি মেজবাবুকে লিখে এখনই একটা লোক রাইগঞ্জে রওনা ক'রে দেও। চিঠিতে লিখে দেও যে, আমি বিশেষ বিবেচনা করে দেখ্‌লাম যে, তারক বাবুর অংশ আমি না কিন্‌লে তাঁকে

বড়ই অস্থবিধায় পড়তে হবে। সেই জন্য আমি সম্মত হলাম। তাঁর যদি কোন অমত না থাকে, তা হ'লে তিনি যেন প্রস্তুত হয়ে আসেন; এক সঙ্গে জেলায় গিয়ে একেবারে লেখাপড়া ক'রে, রেজেষ্টরী করে, সব কাজ শেষ করে আসা যাবে। তাঁর অংশের ন্যায্য মূল্য তিনি যা বল্‌বেন, তাতেই আমি সম্মত আছি। তবে, এ কথাটাও লিখে দিও যে, এই বিষয়ের দখল পাবার জন্য অনেক মামলা-মোকদ্দমা করতে হবে; তাতে বিস্তর টাকাও ব্যয় করতে হবে; তিনি যেন সেই কথাটা বিবেচনা করে মূল্যের সম্বন্ধে আমাকে আদেশ করেন।” তাহার পর উপস্থিত সকলকে বলিল “দেখ, তোমরা আজকার এই ব্যাপার ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে বোলো না। মানী লোকের মান রক্ষাই করতে হয়, নষ্ট করতে নেই। আজ যা হয়ে গেল, তা আমরাই জান্‌লাম। খুব সাবধান, এ কথা যেন আর কেহ জান্‌তে না পারে।”

রাধাবল্লভ তখনই পিতার কথামত পত্র লিখিয়া একজন লোককে রাইগঞ্জে রওনা করিয়া দিল।

[২৩]

নিতাই কুণ্ডুর পত্র পাইয়া তারক নিশ্চিন্ত হইলেন এবং কুণ্ডুর প্রস্তাব স্বীকার করিয়া পত্রের উত্তর দিলেন; লিখিয়া দিলেন যে, পরদিন তিনি শ্যামপুর যাইবেন। তাহার পর তিনি মহেন্দ্রকে বলিলেন “ভাই মহেন্দ্র, তুমি আর আফিস

কামাই করে এখানে থেকে কি করবে। তুমি কল্‌কাতায় যাও। আমি লেখাপড়াটা শেষ করেই তোমার ওখানে যাব। কিন্তু যে রকম আমার মনের অবস্থা, তাতে আমার স্ত্রী যে আমাকে একেলা যেতে দেবেন, তা মনে হয় না। তুমি একটা বাড়ী দেখে-শুনে ভাড়া ক'রে আমাকে পত্র লিখো; আমি তোমার পত্র পেলেই সকলকে নিয়ে কল্‌কাতায় যাব। তবে, তুমি তোমার কাজের ক্ষতি করে, এই সব নিয়ে থেক না। ছোট-বৌমাকে নিতে কা'লই লোক আস্‌বে। তিনি গিয়ে কয়েকদিন বাপের বাড়ীতে থাকুন; তার পর তাঁকেও কল্‌কাতায় নিয়ে যাওয়া যাবে। তিনি আপাততঃ তাতেই অগত্যা সম্মত হয়েছেন।"

মহেন্দ্র বলিলেন "আমি আরও দুই তিন দিন থাক্‌তে পারি। আমি বলি কি, দুইজনেই জেলায় গিয়ে লেখাপড়া শেষ করে, আমি ঐ পথে কল্‌কাতায় চলে যাব, আর তুমি এখানে ফিরে এস।"

সেই কথাই স্থির হইল। তারক বাড়ীর মধ্যে যাইয়া যখন সুপ্রভাকে এই সংবাদ জানাইলেন, তখন সুপ্রভার মুখ মলিন হইয়া গেল, তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

তারক মনে করিলেন, বিষয় গেল, সেই জন্যই বুঝি সুপ্রভা কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন "তুমি অমন বিষণ্ন হ'লে কেন? আমি ত নিশ্চিন্ত বোধ করছি। সব বালাই গেল। এখন কল্‌কাতায় গিয়ে

যা হোক একটা কাজকর্ম্ম নিয়ে চুপচাপে থাকা যাবে; দাদার সঙ্গে আর কোন গোল হবে না; তিনিও আর কিছু বল্‌তে পারবেন না। মানুষের যখন যে অবস্থা হয়, ভগবান্ যখন যা দেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হয়। আমাদের অদৃষ্টে সুখ নেই, তা ব'লে আর কি করব। তুমি মন ভার কোরো না। বিষয় নিয়ে কি হবে? ঐ একটা মেয়ে বই ত নয়; ও ত দুদিন বাদেই পরের ঘরে চলে যাবে; তখন আর কি? কোন ভাবনাই নেই।"

সুপ্রভা তারকের মুখের দিকে কাতরনয়নে চাহিয়া বলিলেন "আমি সে জন্য ব্যস্ত হই নি। তোমার মন যদি শান্ত হয়, তা হ'লে আমি গাছতলাতেও থাক্‌তে পারি; তাতে আমার একটুও কষ্ট হবে না—আমি সব সইতে পারব। কিন্তু আমার মনে একটা ভাবনা হয়েছে। এই কা'লই কুণ্ডু কিছুতেই তোমার অংশ কিনতে সম্মত হোলো না; আর একটা রাত যেতে না যেতেই তার মন ফিরে গেল; এই কথাই আমি ভাব্‌ছি। এই সম্মতির মধ্যে অন্য কোন কারণ ত নেই?"

তারক বলিলেন "আর কি কারণ থাক্‌তে পারে? নিতাই কুণ্ডুর যথেষ্ট টাকা আছে। তার ছেলেও মানুষ হবার মত হয়েছে। তাই হয় ত সে মনে করেছে, ছেলেটাও কি তারই মত সুধু সুদ গণনা করেই জীবন কাটাবে। বিশেষ আমাদের জমিদারীর সকল অবস্থাই নিতাই কুণ্ডু জানে। যদি

সস্তায় এমন জমিদারীর অংশটা পাওয়া যায়, তা হ'লে সে ছাড়বে কেন? এই সকল কথাই হয় ত সে রাত্রিতে ভেবেছে। তাই সকালে আমাকে পত্র লিখেছে।"

সুপ্রভা বলিলেন "কি জানি, কথাটা যেন ও-ভাবে আমি নিতে পারছি নে। দেখ, বড়ঠাকুর যাই করুন না কেন, তিনি ত তোমার ভাই! তোমার পিতৃপুরুষের জমিদারী নিয়ে দশজনে মারামারি করবে, বিষয়টা ছারখার হয়ে যাবে; আর আমরা তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব! কথাটা মনে করলেও কষ্ট হয়। তবে, উপায় যে আর কিছু নেই, তা জানি। কুণ্ডু না কিনে, আমার ভগিনীপতিই যদি কিন্‌তেন, বা আমিই যদি আমার বাবার দেওয়া টাকা দিয়ে এবং আর না হয় কিছু ধার করেই কিনে রাখতাম, তা হ'লেই কি বিষয় রক্ষা পেত? তা নয়। তবুও মনটা যেন কেমন ক'রে উঠল। এক-একবার মনে হচ্চে, কুণ্ডুকে বলিয়া পাঠান হোক যে, সে যেন নালিস করে টাকা আদায় করে নেয়। কিন্তু তাতেই বা কি হবে? তোমার উপর বড়ঠাকুরের যে সন্দেহ, তা ত যাবে না; আরও বেড়ে উঠ্‌বে। না, না—তুমি যা ঠিক করেছ, তাই ভাল। বিষয়ের অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে। তুমি যে মহত্ত্ব দেখাচ্ছ, তা সকলেই বুঝ্‌বে; আর সকলেরই বিশ্বাস হবে যে, তুমি যথা-সর্ব্বস্ব দিয়ে ভাইয়ের সন্দেহ দূর করেছ। সেই ভাল! ও কথা ভেবে আর আমি মন খারাপ করব না। তুমি বেশ করেছ। আমাদের এ দারিদ্র্যকে আমি ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব'লে বরণ

করে নিতে পারব। ভাই-ভাইয়ে ঝগড়া-বিবাদ ক'রে মুখে কালী মাথায় চাইতে এ দারিদ্র্য সহস্রগুণে ভাল।"

তারকের মুখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া তিনি যাহা পাইলেন, তাঁহার মনে হইল কুবেরের ভাণ্ডার পাইলেও বুঝি তাঁহার এত আনন্দ, এত সুখ বোধ হইত না। তিনি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা সাধ্বীর মুখের দিকে চাহিলেন;—দেখিলেন সে মুখে আনন্দ খেলিতেছে; তাঁহার মনে হইল, আজ তাঁহার সর্ব্বস্বদান সফল হইল।

"মেজদি! ও মেজদি!" বলিয়া চীৎকার করিতে-করিতে এই সময়ে রঙ্গিনী সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সুপ্রভা তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দ্বারের কাছে যাইয়া বলিলেন "ওরে আস্তে, আস্তে, মেজবাবু যে উপরে রয়েছেন। তুই হলি কি রঙ্গিনি!"

রঙ্গিনী অমনি চুপ করিয়া গেল। তারক বলিলেন "ওগো, তুমি বৌমাকে উপরে ডেকে নিয়ে এস, আমি নীচে নেমে যাচ্ছি। ওঁর বোধ হয় কোন জরুরী কথা আছে।"

সুপ্রভা বলিলেন "তুমিও যেমন। ও ঐ রকমই, তা কি আর তুমি জান না? কি একটা খেয়াল মনে হয়েছে, আর 'মেজদি, মেজদি' ক'রে দৌড়িয়েছে।" রঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুই তা হ'লে উপরে উঠে আয়। আর লজ্জা করে কি হবে! তোর কি আর এখন লজ্জা সরম আছে? উঠে আয়, মেজবাবু নীচে যাবেন।"

রঙ্গিনী তখন চোরের মত ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া এক

দৌড়ে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। তারক নীচে নামিয়া গেলেন।

তখন সুপ্রভা রঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিলেন "এখন এদিকে আয়। শুনি মেজদিকে কি সংবাদ দিতে এসেছিস্।"

রঙ্গিনী বাহিরে আসিয়া বলিল "শোন মেজদি, আমার আর বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না।"

সুপ্রভা বলিলেন "কেন? আমাদের এই বাড়ী কি তোর খুব মনে লেগেছে। তা বেশ, তুই এখানে থাক, আমরা কল্‌কাতায় চলে যাই।"

রঙ্গিনী বলিল "এই বুঝি তোমার বিদ্যে! সবাই বলে, মেজদিদি ভারি বুদ্ধিমতী! তোমার বুদ্ধি আছে, না ছাই আছে। আমি কি তাই বল্‌ছি। আগে কথাটা শোনই। আমাদের সন্ন্যাসী বাবু (মহেন্দ্রকে রঙ্গিনী সন্ন্যাসী বাবু নামকরণ করিয়াছিল) অতুলবাবুকে বলছিলেন যে, তিনি দুইএক দিনের মধ্যেই কল্‌কাতায় গিয়ে একটা বাড়ী ভাড়া করে সকলকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন। তা হলে আর আমি বাপের-বাড়ী যাব কেন? আমি মনে করেছিলাম, তোমরা অনেকদিন এখানে থাক্‌বে; তাই আমি বাপের-বাড়ী গিয়ে ততদিন থাকৃতে স্বীকার করেছিলাম,—তাও কি ইচ্ছা করে; তোমার বকুনির জ্বালায় থাকৃতে না পেরে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পাঁচসাত দিন পরেই যখন কল্‌কাতায় যাওয়া হবে, তখন আর আমি এখন বাপের-বাড়ী যাব না। এখন কি তোমাদের

ছেড়ে থাকা যায়? এই কথা তোমার বোনকে বল্‌তে তিনি বল্‌লেন যে, এখানে থাক্‌তে গেলে এই কয় দিনের বাড়ীভাড়া আর খোরাকী দিতে হবে। আমি তাইতে বল্‌লাম যে, বেশ আমি তাই দিয়েই এখানে থাক্‌ব। তিনি আগাম চাইলেন। সেইজন্য তোমার কাছে টাকা চাইতে এসেছিলাম। তুমি এখনই বাড়ীভাড়া আর খোরাকীর টাকা আগাম দাও; আমি দিদিকে দিয়ে আসি।"

সুপ্রভা হাসিয়া বলিলেন "কত খোরাকী বন্দোবস্ত হল?"

"বন্দোবস্ত আবার কি হবে? দশ দিন ত—বেশ দশ দিনে পঞ্চাশ টাকা দেব।"

সুপ্রভা বলিলেন "আমরা যে পাইক-বরকন্দাজদের রোজ পাঁচ-আনা হিসাবে খোরাকী দিই।"

রঙ্গিনী বলিল "আমি কি পাইক বরকন্দাজ—আমি যে মনোহরপুরের বড়বাড়ীর বৌ!"

সুপ্রভার মুখ অমনি মলিন হইয়া গেল; একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বড়বাড়ীর সম্বন্ধ যে কা'লই ঘুচে যাবে বোন!"

রঙ্গিনী বলিল "বেশ ত! তার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস কেন? আমরা ত ইচ্ছা করেই জমিদারী বেচে ফেল্‌ছি। তা ব'লে ত আর শ্বশুর-বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘোচে না। দিদি! তুমি অমন করে মুখ ভার কোরো না। আমার বড় কষ্ট হয়।" এই বলিয়া রঙ্গিনী সহসা কেমন গম্ভীর হইয়া পড়িল।

সুপ্রভা বলিলেন "এক-একবার ত মনটাকে বেশ উঁচু

সুরেই বাঁধি; কিন্তু দুর্ব্বল মন, ঠিক থাকতে চায় না; তাই আবার ভাবি, এ কি হোলো!”

রঙ্গিনী বলিল “মেজদি, তুমি যদি অমন করে কাতর হও, তা হ’লে মেজঠাকুরের মন খারাপ হবে। তিনি মনে করবেন, আমরা বুঝি বড় কাতর হয়েছি। কাতর হব কেন? মেজঠাকুর দেবতা; তিনি দেবতার মত কাজ করেছেন। আমরা তাতে গৌরবই বোধ করব। সত্যি দিদি, আমি ত ও-সব গ্রাহ্যই করি নে। দুঃখ কষ্ট যদি হাসিমুখে সইতেই না পারলাম, তবে আর মেয়ে হয়ে জন্মেছি কেন?”

সুপ্রভা রঙ্গিনীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন “রঙ্গিনী, তোকে আমি চিনতে পারলাম না; তুই কখন যে কি রূপ ধরিস, তা আমি মোটেই ঠিক করতে পারি নে।”

রঙ্গিনী অমনি হাসিয়া উঠিয়া বলিল—

“কখন কি রঙ্গে থাক, বুঝি না ভঙ্গিমা দেখে।
বাঁকা পথে সদা গতি, সোজা পথ দূরে রেখে।”

[২৪]

পরদিন প্রাতঃকালেই তারক ও মহেন্দ্র কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া শ্যামপুরে গেলেন। নিতাই কুণ্ডু তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

তাঁহারা পৌঁছিবার পরই নিতাই বলিল “মেজবাবু,

আপনার অংশ বেচ্‌বার জন্য আর কাকে খোসামোদ করতে যাব। বিশেষ, ভেবে দেখলাম যে, আপনি বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন; এ সময় আপনার উপকার করা কর্ত্তব্য; তাই আমিই অংশটা কিনে নেব। বাবাজীর নিতান্ত ইচ্ছা যে, কিছু জমিজমা করে। আরও এক কথা, বড়বাবু খুব শাসিয়েছেন যে, যে ঐ অংশ কিন্‌বে, তাকে তিনি দেখে নেবেন। সেটারও একটা পরীক্ষাই হোক না।• জমিদারীর কাগজপত্র ত কিছু আপনাদের হাতে নেই। তা যা থাক, আমার কাছে ত কিছু ছাপা নেই। আমি সে সব ঠিক করে নিতে পারব। আপনারা এখানেই স্নান-আহার করুন। আপনারা যে আজ সকালেই আস্‌বেন, তা বুঝতে পেরেই আহারের আয়োজন করে রেখেছি। গরীবের বাড়ীতে আপনাদের মত মহৎ ব্যক্তির পায়ের ধূলো পড়েছে, এতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি।" পূর্ব্ব দিন কার্ত্তিক ও মাধবের সঙ্গে তাহার যে বচসা হইয়াছিল, তাঁহারা যে শ্যামপুর আসিয়াছিলেন, নিতাই এ কথা আর প্রকাশ করিল না।

যথাসময়ে আহারাদি শেষ করিয়া কুণ্ডু মহাশয়ের সঙ্গে তারক ও মহেন্দ্র জেলায় যাত্রা করিলেন। তারকের আগমনের পরই নিতাই কুণ্ডু লোক পাঠাইয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিয়াছিল।

জেলায় পৌঁছিয়া তারক বলিলেন "কুণ্ডু মশাই, আমাদের যে উকিল এখানে আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে কাজ নেই; আপ-

নার কাজকর্ম্ম যে উকিলের দ্বারা হয়, তাঁর দ্বারাই লেখাপড়া করা হোক্।"

নিতাই তাহাতেই সম্মত হইল। জেলায় পৌঁছিতে তাঁহাদের অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সে রাত্রিতে নৌকাতেই থাকিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনজনে উকিলের বাসায় উপস্থিত হইলেন। দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র কিছুই ছিল না; নিতাই বলিল যে, তাহার প্রয়োজনও নাই। তারক তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তির একটা তালিকা করিয়া দিলেন; যেখানে-যেখানে কারবারের আড়ত ছিল, তাহাও লিখিয়া দিলেন। তিনি কেবল তাঁহাদের বসতবাড়ী বড়বাড়ীটা বিক্রয়-তালিকার অন্তর্গত করিলেন না; বলিলেন "ঐ শেষ নিদর্শনটুকু থাকুক।" কথাটা বলিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, কি হতভাগ্য তিনি! পুত্র উপযুক্ত হইয়া পিতার বিষয়-সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে, আর তিনি এমনই কুপুত্র যে, আজ তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইল।

উকিল বাবু সমস্ত কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কলিকালে এই বাঙ্গালা দেশে যে এমন লোক থাকিতে পারে, সে কথা তিনি জানিতেন না। তিনি বলিলেন "তারক বাবু, এই ওকালতী ব্যবসা করতে-করতে বুড়ো হয়ে গেলাম; কিন্তু এমন কথা কোন দিন শুনি নি। আপনাদের বড়বাড়ীর দু' দশটা মোকদ্দমায় কখনও বা আপনাদের পক্ষে কখনও বা

বিপক্ষে কাজ করেছি, তখন আপনাদের দুই ভাইয়ের মিল দেখে কত প্রশংসা করেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, সামান্য একটা কথা নিয়ে কার্ত্তিক বাবু যে এমন করবেন, তা আমি কেন, এ জেলার যাঁরা আপনাদের জানেন, তাঁরা কেহই মনে করেন নাই। আপনি যে নির্ব্বিরোধী লোক, তাও আমরা জান্‌তাম; কিন্তু এক কথায় যে আপনি এমন করে যথাসর্ব্বস্ব ছেড়ে দিতে পারেন, তা কোন দিনও মনে করি নি। যে এ কথা শুনবে, সেই আপনাকে দেবতা বলবে। কুণ্ডু মশাই, আপনাকে কিন্তু ব'লে রাখছি যে, কার্ত্তিক মিত্রের সঙ্গে এই বিষয়-বিভাগ নিয়ে আপনাকে খুব লড়তে হবে। আমরা উকিল মানুষ, এমন এক-আধটা গোলমাল বাধলে আমাদের বিলক্ষণ দু' পয়সা প্রাপ্তিই আছে। তবুও কি জানেন কুণ্ডু মশাই, আপনি ত কখন খতের নালিস ছাড়া আর কিছু করেন নি; তাই কথাটা জানিয়ে রাখ্‌লাম। এ কিন্তু সুদের হিসাব করা নয়। জমিদারী করতে গেলেই মামলা-মোকদ্দমা করতেই হয়; এ ত দেখছি মহাব্যাপার। প্রথমেই ত পার্টিসনের মামলা; তারপর ক্রমশঃ প্রকাশ্য। বুঝেছেন ত কুণ্ডু মশাই! তা আপনার টাকার অভাব নেই; বুড়া বয়সে এ দিকেও একবার হাত দেখিয়ে যান না। সে কথা থাকুক; এখন কত টাকা পণ স্থির করেছেন, সেইটা ব'লে ফেলুন, আমি লেখাপড়াটা শেষ করে দিই। সকাল-সকাল কাছারীতে না গেলে রেজেষ্টরী হবে না। পণের কথা জান্‌লে তবে ত কাগজ আন্‌তে পারা যাবে।"

নিতাই কুণ্ডু বলিল "সে মেজবাবু যা ব'লে দেবেন, তাই হবে। আমি ও'র উপরই নির্ভর করে বসে আছি।"

তারক বলিলেন "তা কি হয় কুণ্ডু মশাই! আমি ত লাখ টাকা পেলে বেঁচে যাই।"

নিতাই বলিল "তা বেঁচে যেতে পারেন; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনি অন্যায্য কথা বল্‌তেই পারেন না।"

তারক বলিলেন "কুণ্ডু মশাই, আপনি ত সবই জানেন; আপনি যা বল্‌বেন, আমি তাই মেনে নেব।"

নিতাই কুণ্ডু বলিল "বেশ, তাই হবে! আমি আপনার অংশের জন্য পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দেব। ত্রিশ হাজার টাকা দেনা-শোধে যাবে, বাকী পনর হাজার টাকা রেজেষ্টরী আফিসে আজই দিয়ে দেব।"

তারক বলিলেন "পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা! আমি ত অত টাকা আশা করি নি। অবশ্য আমার অংশের মূল্য যে ওর থেকে কম, তা আমি বল্‌ছি নে; কিন্তু আপনিই ত বলেছিলেন যে, এ অংশ যে কিনবে, তাকে ওর পিছনে অনেক টাকা খরচ করতে হবে। সে কথাটা আপনি ভুলে গেলেন কেন, কুণ্ডু মশাই।"

নিতাই বলিল "মেজবাবু, তিলির ছেলে নিতাই কুণ্ডু টাকার হিসাব কোন দিন ভোলে না। আমি সে সব ভেবে দেখেই কথাটা বলেছি। ও নিয়ে আর তর্ক করবেন না।"

তারক বলিলেন "কুণ্ডু মশাই, আমাকে কি আপনি এতই ছেলেমানুষ মনে করেন যে, আপনার মনের কথা আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে একেবারে পথের ফকির হতে আপনি দেবেন না, এই আপনার অভিপ্রায়। কি বল্‌ব কুণ্ডু মশাই, যিনি আমার আপনার জন—যিনি আমার দাদা, তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন না; আর আপনি আমার তুরবস্থা দেখে এত দয়া করলেন। এ কথা আমার মনে থাক্‌বে, কুণ্ডু মশাই! যদি ভগবান কখন দিন দেন, যদি কোন দিন আবার সৌভাগ্যের মুখ দেখ্‌তে পাই, তা হলে আপনার এই অসীম দয়ার ঋণ আমি কথঞ্চিৎ শোধ করবার চেষ্টা করব।" তারক আর কথা বলিতে পারিলেন না; তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

নিতাই কুণ্ডু বলিল "মেজ বাবু, একটা কথা আপনাকে এতক্ষণ বলি নাই; বল্‌বার আবশ্যকও মনে করি নাই। বৃথা আপনার মনে কষ্ট দেওয়া হবে, মনে করেই কথাটা চেপে গিয়েছিলাম। দেখুন, কা'ল সকালে কার্ত্তিকবাবু আর মাধব ঠাকুর আমার বাড়ীতে এসেছিল। তারা আমাকে ভয় দেখাতে লাগ্‌ল যে, আমি আপনার অংশ কিন্‌লে আমার ভিটেমাটী উচ্ছন্ন করে দেবে। আমিই বা ছেড়ে কথা বল্‌ব কেন? আমিও বেশ দশকথা শুনিয়ে দিয়েছি। তারাও যেমন চোটপাট কথা বল্‌তে লাগল, আমিও তেমনি জবাব দিতে লাগলাম। তাইতেই ত আমার এ অংশ কিনবার

জন্য জেদ বেড়ে গেল। এখন একবার দেখ্‌তে হবে, তারা কত বড় বীর।”

তারক বলিলেন “কুণ্ডু মশাই, আপনার হাতে ধরে আমি বল্‌ছি, আপনি নিজে হ’তে দাদার সঙ্গে বিবাদ করবেন না; তিনি যদি অন্যায় করেন, তা হ’লে অবশ্য তার প্রতিবিধান করবেন। কিন্তু এই আমার প্রার্থনা, আমার কথা মনে করে তাঁকে অনেকটা ক্ষমা করবেন।”

নিতাই বলিল “মেজবাবু, বিষয়-রক্ষার জন্য যা করা দরকার, তা আমাকে করতেই হবে। সকলেই যদি আপনার মত দেবতা হ’ত, তা হলে এ পৃথিবীটা যে স্বর্গ হয়ে যেত মেজবাবু!”

উকিল বাবু তাঁহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন “তা হলে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকাই দর সাব্যস্ত হ’ল।”

তারক কথা বলিবার পূর্ব্বেই নিতাই কুণ্ডু বলিল “হাঁ, পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকাই ঠিক হল। আপনি কাগজ কিনে এনে লেখাপড়া শেষ করুন। আমি পনর হাজার টাকার নোটের নম্বর আপনাকে বলে দেব।”

সেইদিনই লেখাপড়া ও রেজেষ্টরী শেষ হইয়া গেল;—মনোহরপুরের বড়বাড়ীর উজ্জ্বল-রত্ন শ্রীযুক্ত তারকনাথ মিত্র সর্ব্বস্বের বিনিময়ে, নিতাই কুণ্ডুর দয়ার দান পনর হাজার টাকা লইয়া রাইগঞ্জে চলিয়া গেলেন; মহেন্দ্র ঐ দিক্ দিয়াই কলিকাতায় গমন করিলেন। তিনি বলিয়া গেলেন যে,

কলিকাতায় পৌছিয়াই তিনি একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া পত্র লিখিবেন এবং তারক যেন সকলকে লইয়া অনতিবিলম্বে কলিকাতায় যান।

তারক রাইগঞ্জে যাইয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এতদিনে বড়বাড়ীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ লোপ হইল; তিনি আর বড়বাড়ীর কেহ নহেন। কি অপরাধে এমন দয়াময় ভ্রাতা তাঁহার উপর এত নির্দ্দয় হইলেন? তিনি ত কোন অপরাধই করেন নাই; তবে ভগবান তাঁহাকে এ শাস্তি কেন দিলেন? যে দাদাকে তিনি পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন,—যে দাদার সম্মুখে তিনি কোন দিন মাথা উঁচু, করিয়া কথা বলেন নাই,—যে দাদার আদেশ তিনি কখনও অমান্য করেন নাই; সেই দাদা তাঁহার উপর বিরূপ হইলেন কেন? তিনি যে কোন কারণই খুঁজিয়া পাইলেন না।

স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া সুপ্রভা বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। দিবানিশি এমন করিয়া চিন্তা করিলে তিনি যে অসুস্থ হইয়া পড়িবেন! সুপ্রভা কত রকমে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তারকের মন প্রবোধ মানে না। তিনি যখন-তখনই বলেন "বিষয়-সম্পত্তি গেল, তাহার জন্য ত আমি কাতর হই নাই; কিন্তু দাদা যে আমার পর হইয়া গেলেন, বিনা অপরাধে তিনি যে আমাকে এমন গুরুতর শাস্তি দিলেন, ইহাতেই আমার

মরণাধিক যন্ত্রণা হইয়াছে। একথা যে আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না।"

এইভাবে প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। রঙ্গিনীর মাতা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য রাইগঞ্জে লোক পাঠাইয়া দিলেন; রঙ্গিনী সে লোক ফিরাইয়া দিল। সে তাহার মাতাকে বলিয়া পাঠাইল যে, এ সময়ে সে তাহার মেজদিদিকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। কলিকাতায় যাইয়া কিছুদিন থাকিবার পর যখন তাহার মেজঠাকুরের মন স্থির হইবে, তখন সে মায়ের কাছে যাইবে। সুপ্রভা তাহাকে কত বুঝাইলেন, কত ভয় দেখাইলেন, কিন্তু কোন কথাই সে শুনিল না। সে সুধু একই কথা বলে "মেজদি, যেখানে তোমরা থাকবে, আমিও সেইখানেই থাকব। কলিকাতায় ছোট বাড়ীতে থাকতে তোমাদের কষ্ট হবে না, আর আমার মত হতভাগীরই কষ্ট হবে! কি যে কথা তোমরা বল, তা আমি বুঝতে পারি না। বড়মানুষ—বড়মানুষ;—ভারি ত বড়মানুষ! বড়মানুষ কাকে বলে জান? বড়মানুষ আমার মেজঠাকুর, —বড়মানুষ ঐ তিলির ছেলে নিতাই কুণ্ডু! পয়সা থাকলেই বড়মানুষ হয় না। মনে যে বড়, সেই বড়মানুষ। তুমি মেজদি! সেই বড়মানুষের স্ত্রী—তুমিই আসল বড়মানুষ। আর আমার কথা বলছ, আমি এতদিন ছোটমানুষ ছিলাম,—এখন তোমাদের সেবার অধিকার পেয়ে আমি মস্ত বড়মানুষ হয়ে গিয়েছি।"

সুপ্রভা এই সকল কথা শুনিয়া বলেন "তুই যে দিনে-দিনে পণ্ডিত হয়ে পড়লি! আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোর মনে কি একটুও কষ্ট হয় না, তুই এমন হেসে-খেলে বেড়াস কি করে?"

রঙ্গিনী অমনি গম্ভীর হইয়া বলে "মেজদি, এত কথা বোঝ, আর ঐটী বোঝ না। আমি জোর করে হাসি দিদি! আমি হাসি দিয়ে, আনন্দ দিয়ে আগুন চেপে রাখ্‌তে চাই। তা না করলে যে কোন্ দিন আমি মরে যেতাম। আমার যখন বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে, তখন আমি কাঁদতে পারি নে দিদি! আমি তখন অনেক চেষ্টা করে হাসি-তামাসা এনে সেটাকে চাপা দিতে যাই। মেজদি! পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করেছিলাম, তারই এই শাস্তি।"

[২৫]

ইহার পর দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসরের বড়বাড়ীর ঘটনা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব; কারণ এই দুই বৎসরের মধ্যে এমন মাস যায় নাই; যে মাসে হয় কার্ত্তিক, আর না হয় নিতাই কুণ্ডু নিশ্চিন্তভাবে থাকিবার অবকাশ পাইয়াছে। ক্রমাগত মামলা মোকদ্দমা চলিয়াছে। প্রথম-প্রথম নিতাই কুণ্ডু বড় একটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই তাহার নূতন জমিদারী করা। এতকাল সে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়াছে; তাহার পর টাকা লেন দেন করিয়াছে;

কেমন করিয়া জমিদারী করিতে হয়, তাহা সে জানিত না। তারকের অংশ ক্রয় করিবার পর সে দুই চারি জন গোমস্তার সাহায্যে জমিদারীর কাজ আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু পাকা জমিদার কার্ত্তিক মিত্রের সঙ্গে সে কেমন করিয়া পারিয়া উঠিবে। তাহার পর মাধব ঠাকুরের মত একটা প্রকাণ্ড মামলাবাজ তাহার সহায়; সুতরাং নিতাই কুণ্ডু কিছুদিন মোটে আমলই পাইল না। শেষে সে এক জন অতি উপযুক্ত ও বহুদর্শী নায়েব নিযুক্ত করিল; তাহারই উপর জমিদারীর সমস্ত ভার দিল।

এই নায়েবটীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। জমিদারের কার্য্যে সে বিশেষ পারদর্শী; অর্থাৎ মামলা-মোকদ্দমা করিতেও সে যেমন অগ্রসর, কাজের ব্যবস্থা করিতেও তেমনই তৎপর। এই নায়েব যখন নিতাই কুণ্ডুর পক্ষে নিযুক্ত হইল, তখন কার্ত্তিক মিত্রের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া গেল। একদিকে কার্ত্তিক মিত্র আর তাঁহার পরামর্শদাতা মাধব ঠাকুর, অপর দিকে এই নায়েব। নিতাই কুণ্ডুরও কেমন জেদ পড়িয়া গেল। যে কুণ্ডু-সন্তান একটী পয়সা অপব্যয় করিতে কাতর হইত, এখন সে জিদে পড়িয়া দু-শ পাঁচ-শ টাকা খরচ করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। শুনিয়াছি জমিদারীর একটা নেশা আছে। যে নিতান্ত ভালমানুষ, যে অন্য কার্য্যে কৃপণতা করে, সেও যখন জমি-জমা করে, তখন মামলা-মোকদ্দমা করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। নিতাই কুণ্ডুরও তাহাই হইল; সে তাহার

নব-নিযুক্ত নায়েবকে একদিন ডাকিয়া বলিল "দেখুন নায়েব মশাই, আপনাকে একটা সোজা কথা বলিয়া দিই। কথা এই যে, কার্ত্তিক মিত্রকে বিপন্ন করিতে হইবে। তাহাকে এমন ভাবে চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিতে হইবে যে, সে আমার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় না পায়। তাহা হইলেই আমার কার্য্য সফল হইবে। যত টাকা লাগে, আমি দিব; কিন্তু কার্ত্তিক মিত্তিরের মাথাটা আমার কাছে নোয়াইয়া দিতে হইবে।"

জমিদারের কর্ম্মচারীরা মামলা-মোকদ্দমা করিতে বড়ই অগ্রসর; মনিবের ক্ষতি হউক বা লাভ হউক, সে কথা এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা ভাবে না। কোন রকমে একটা মোকদ্দমা বাধাইয়া দিতে পারিলেই তাহাদের দু-পয়সা আয় হয়! তারকের নায়েবটীও এই শ্রেণীর মানুষ। জমিদারী শাসন করিতে সে যেমন পটু, মামলা-মোকদ্দমা করিতেও সে তেমনই প্রস্তুত। সে বেশ বুঝিয়া লইল, লাগে টাকা, দিবে নিতাই কুণ্ডু! সে এমন সুযোগ ছাড়িবে কেন? তাহার পরেও সুবিধা হইল যে, তাহার মনিব নিতাই কুণ্ডু জমিদারীর কিছুই বোঝে না। এমন মনিব পাইয়া সে যে চুপ করিয়া থাকিবে, তাহা হইতেই পারে না। আবার প্রতিপক্ষও সাধারণ লোক নহে। কার্ত্তিক মিত্র পাকা লোক, তাহার পর তাঁহার পরামর্শদাতা মাধব ঠাকুর। এমন মণিকাঞ্চন সংযোগে যাহা হইবার, তাহাই হইতে লাগিল; দুই পক্ষেরই জিদ বাড়িতে লাগিল। প্রজারা সুবিধা

পাইল; তাহারা খাজানা দেওয়া বন্ধ করিল; আদায় করিতে গেলে সকলেই বলে "আগে জমিদারদের গোল মিটুক, তখন খাজানা দিব।" নিতাই ইহাতে ভয় পাইল না; কিন্তু কার্ত্তিক বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। একদিকে বিষয়-বিভাগের মোকদ্দমা, অপর দিকে প্রজাবিদ্রোহ। কার্ত্তিকের পরামর্শদাতা মাধব ঠাকুর দুই হাতে লুণ্ঠন আরম্ভ করিল; অকারণ ফৌজদারী বাধাইতে লাগিল। আগুন ভাল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার মল্লিক বাবুরাও আর নীরব থাকিলেন না; তাঁহারাও তখন কার্ত্তিক মিত্রকে নানাপ্রকারে বিপন্ন করিবার আয়োজন করিলেন। দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই কার্ত্তিক মিত্র সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন; চারিদিকে ধারকর্জ্জে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

উত্থান-পতন জগতের নিয়ম। যখন মনোহরপুরে কার্ত্তিক এই প্রকার বিপদ-জালে জড়িত, যখন তাঁহার জমিদারী রক্ষার আর উপায় নাই, তখন তারক কলিকাতায়। এই দুই বৎসর তারক নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। সপরিবারে কলিকাতায় যাইয়া প্রথম মাসখানেক তিনি কিছুই করিলেন না, সে সময় তাঁহার কোন কার্য্য করিবার উৎসাহ ছিল না; তিনি দিনরাত বাসায় বসিয়া কেবল অতীত ঘটনার চিন্তাতেই সময় অতি-বাহিত করিতেন। মহেন্দ্র কতবার তাঁহাকে বাসার বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তারকের একই কথা "আমার আর কিছু করিবার মত মনের বা শরীরের বল নাই।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দাও—আমাকে নীরবে মরিতে দাও।”

কিন্তু তিনি চুপ করিয়াও থাকিতে পারিলেন না, মৃত্যুও তাঁহার আবেদন গ্রহণ করিলেন না। দুই মাস পরেই, এমন ভাবে বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সুপ্রভা তখন তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, কোন প্রকার কাজ-কর্ম্মে যোগদান করা তাঁহার কর্ত্তব্য। কাজে মন দিলেই তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ হইবে।

ব্যবসা করিতে হইলে টাকার প্রয়োজন! তারকের ত বেশী টাকা নাই। জমিদারী বিক্রয় করিয়া যে পনর হাজার টাকা তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা আনিয়া সুপ্রভার হাতে দিয়াছিলেন। তাহার পর যখন ব্যবসায়ের কথা উঠিল, তখন সুপ্রভা বলিলেন “কি করিবে ঠিক কর, টাকার অভাব হইবে না।”

তারক বলিলেন “এতদিন ত সে কথা মোটেই ভাবি নাই। তোমরা এখন যাহা করিতে বল, তাহাই করি।”

তখন মহেন্দ্র বলিলেন “তারকদা, তুমি পাটের ব্যবসা আরম্ভ কর। আমাদের আফিসের সাহেবদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই; তুমি তাঁদের পাটের এজেণ্ট হও।”

তারক বলিলেন “তাই হোক। তোমরা আমাকে যা কর্‌তে বল্‌বে, আমি তাই কর্‌ব।”

তারক পাটের কাজ আরম্ভ করিলেন। এ সকল কার্য্যে

তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। সুপ্রভা এই কারবার করিবার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দিলেন এবং তারককে বলিলেন "এটা আমাদের যৌথ-কারবার, বুঝলে? তোমার দশ হাজার, স্বর্ণের পাঁচ হাজার, ছোট বৌয়ের পাঁচ হাজার, আর মহেন্দ্র বাবুর পাঁচ হাজার। লাভের অংশ ঠিক বুঝিয়ে দিতে হবে, হিসাব দাখিল করবার সময় কিন্তু অভিমান করতে পারবে না, তা এখনই বলে রাখ্ছি।"

তারক বলিলেন "মহেন্দ্রের এত টাকা কোথা থেকে এল।"

সুপ্রভা বলিলেন "স্বর্ণ ধার দিয়েছে।"

সেবার পাটের কাজে বেশ সুবিধা ছিল; তারকের মূলধন অল্প হইলেও মহেন্দ্রের আফিসের সাহেবদিগের কৃপায় তিনি বেশী কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। তারকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া এবং ব্যবসায়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বুঝিতে পারিয়া সাহেবেরা খুব উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট টাকাও সরবরাহ করিয়াছিলেন। সেই প্রথম বৎসরের পাটের কাজ শেষ হইলে দেখা গেল যে, খরচ-খরচা বাদে তাঁহাদের এই নূতন কারবারে নয় হাজার টাকা লাভ হইয়াছে।

এই কারবারের ক্যাশ সুপ্রভার নিকট থাকিত। যখন হিসাব হইয়া গেল, তখন সুপ্রভা অংশীদিগকে ডাকিয়া লাভের কথা শুনাইয়া দিলেন। রঙ্গিনী বলিল "ও টাকা কেহই লইতে পারিবে না, ও টাকা সমস্তই কারবারে খাটিবে।"

সুপ্রভা বলিলেন "তা হ'লে সংসার চলবে কি ক'রে ?"

রঙ্গিনী বলিল "এই এতদিন যেমন করিয়া চলিল।" এই বৎসর মহেন্দ্র যাহা বেতন পাইয়াছেন, তাহা আনিয়া সুপ্রভার হাতে দিয়াছেন; রঙ্গিনীর বাপের বাড়ী হইতে যে ৫০৲ টাকা করিয়া তাহার হাতখরচ আসিত, তাহা খরচের মধ্যে যাইত; সুপ্রভারও বাপের প্রদত্ত জমিদারীর অংশ হইতে টাকা আসিত; সুতরাং সংসার চলিবার কোন কষ্টই হইল না।

দ্বিতীয় বৎসরে তারক আরও অধিক উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এ বৎসরে তাঁহাদের আশাতিরিক্ত লাভ হইল; তারক এবার প্রায় কুড়ি হাজার টাকা লাভ করিলেন।

এই সময়ে তারক একদিন সুপ্রভাকে বলিলেন "দেখ, আমার একটা কথা আছে। কথাটা যখন-তখনই মনে হয়েছে, কিন্তু বলিতে পারি নাই। মনোহরপুরের অবস্থা ত সমস্তই শুনেছ। আমার ইচ্ছা যে, আমি একবার দাদার কাছে যাই। এই দুই বৎসরের মধ্যে একবারও দাদাকে দেখি নাই, তাঁকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা করে।" তারকের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

সুপ্রভা বলিলেন "সে ত ভাল কথা! তিনি আমাদের প্রতি যে ব্যবহারেই করুন না কেন, আমরা ত তাঁহারই। তোমার একবার যাওয়াই উচিত। তিনি যে রকম বিপদে পড়েছেন, এ সময় আর তিনি তোমার উপর রাগ করবে

পারবেন না। তবে কথাটা একবার ছোটবৌকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। সে কি বলে শুনি।”

তাহার পর এক সময় রঙ্গিনীকে ডাকিয়া সুপ্রভা বলিলেন “শোন্, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।”

রঙ্গিনী বলিল “কি, কোন গভীর পরামর্শ আছে না কি? আমি কিন্তু তোমাদের পাটের দালালী করতে পারব না; আমার উপর যে বাজার-খরচের ভার আছে, তাই আমি ক'রে উঠ্‌তে পারিনে।”

সুপ্রভা বলিলেন “তা না, তুই তামাসা রেখে শোন্। উনি বল্‌ছিলেন যে, উনি একবার মনোহরপুরে বড়ঠাকুরকে দেখ্‌তে যেতে চান। তাতে তোর মত কি, তাই জিজ্ঞাসা করেছেন।”

কথাটা শুনিয়াই রঙ্গিনী গম্ভীর হইল; তাহার যেন একটা ভাবান্তর হইল। সে বলিল “দিদি, তোমরা কি মনে কর জানিনে; কিন্তু আমি যখনই মনোহরপুরের খবর শুনি, তখনই আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠে। বড়ঠাকুর যাই করুন না কেন, তিনি ত আমাদের বড়ঠাকুর। এক সময় ছিল, যখন তাঁর ব্যবহারে আমরা রাগ করেছিলাম। তাঁর উপরই রাগ করে আমরা সব ছেড়ে দিয়ে চ'লে এসেছিলাম। তার জন্য যা হবার, তা ত খুব হয়ে গিয়েছে—বড়বাড়ী ত একরকম গিয়েছে। এখন কি আমার সে কথা মনে আছে? আমি ত বলি, চল সকলে মিলে বাড়ী যাই। সেখানে গিয়ে বড়-

ঠাকুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইগে! আমরা যে ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম, সব কথা শুন্‌লে তিনি তা বিশ্বাস করবেন। মেজদি, আমাকে তোমরা ভুল বুঝো না। আমি অনেক ভেবেই তখন রাগ করেছিলাম; সে সব কথা আর আমার মনে নেই। না, না—আমাদের আবার অভিমান কি? ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের আবার অপমান কি?"

সুপ্রভা বলিলেন "কিন্তু সে সময় ত তুই-ই রেগে অস্থির হয়েছিলি, সে কথা মনে আছে ত!"

রঙ্গিনী বলিল "মনে থাক্‌বে না কেন? কিন্তু দেখ, আমার রাগ কিন্তু বেশীদিন থাকে না।"

সুপ্রভা বলিলেন "সে কথা যাক্। আমি বলি কি, উনি একেলা মনোহরপুরে যান। তারপর যা হয় করা যাবে।"

[২৬]

নানা কারণে তারকের মনোহরপুর যাইতে কয়েকদিন বিলম্ব হইয়া গেল। এই সময়ে হঠাৎ একদিন একখানি পত্র আসিল। পত্রের উপর কার্ত্তিকের হস্তাক্ষর দেখিয়া তারক তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিলেন। কার্ত্তিক লিখিয়াছেন—

"ভাই তারক,

আমি মৃত্যুশয্যায়। এ সময় তোমাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। যদি দাদাকে ক্ষমা করিতে পার, তাহা হইলে একবার আসিও। তোমার মুখখানি দেখিলে আমি সুখে মরিতে

পারিব। শরীরে সামর্থ্য নাই, সেজন্য আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। ইতি—

তোমার হতভাগ্য দাদা

কার্ত্তিক।"

তারক পত্রখানির কথা কাহাকেও বলিলেন না, কারণ বাসায় বলিলে সকলেই মনোহরপুর যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইবেন; কেহই থাকিতে চাহিবেন না। তারক সুপ্রভাকে ডাকিয়া বলিলেন "যাব-যাব করে সময় যাচ্ছে। আমিই আজই রাত্রের গাড়ীতে মনোহরপুরে যেতে চাই।" সুপ্রভা ইহাতে আপত্তি করিলেন না।

তারক একটু সকাল-সকাল বাহির হইয়া রোগীর পথ্যের উপযুক্ত কিছু জিনিসপত্র কিনিয়া লইয়া রাত্রির গাড়ীতে মনোহরপুর যাত্রা করিলেন।

দুই বৎসর পরে তারক মনোহরপুর যাইতেছেন; কিন্তু তাঁহার মনে আনন্দের উদয় হইতেছে না। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সে বড়বাড়ীর আর সে শ্রী নাই, সে সব কিছুই নাই। আর তাঁহার দাদা—তিনি হয় ত তারকের পথ চাহিয়া রোগশয্যায় পড়িয়া আছেন। এ কথা ভাবিতেই তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার নৌকা মনোহরপুরের ঘাটে লাগিল। তারক তীরে উঠিয়া একটা মাঝির মাথায় জিনিসপত্র দিয়া ধীরে-ধীরে বড়বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। রাত্রি

অন্ধকার; তারক অতি সাবধানে পথ চলিতে লাগিলেন বাড়ীর নিকট আসিয়া তাঁহার পা যেন আর চলে না।

কাছারী বাড়ীর প্রাঙ্গণে যাইয়া দেখিলেন, উঠান জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে; উঠানের একপার্শ্বে একরাশি ইটকাঠ পড়িয়া আছে। অন্ধকারে তিনি কিছুই ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না।

যে কাছারী বাড়ীতে দুই বৎসর পূর্ব্বে দিনরাত লোকের কোলাহল ছিল, আজ সেখানে মানুষের সাড়াশব্দও নাই,—কাছারী ঘর অন্ধকার। তারকের মনে ভয় হইল। তিনি একটু অগ্রসর হইয়া মাঝিকে বলিলেন "ওরে, তুই ডাক ত।"

মাঝি তখন চীৎকার করিয়া ডাকিল "বাড়ীতে কে আছ গো?" কোন উত্তর না পাইয়া মাঝি আরও একটু গিয়া একেবারে দ্বারের নিকট হইতে পুনরায় ডাকিল "বাড়ীতে কে আছ গো!"

এইবার উপরের বারান্দা হইতে কে বলিল "কে গো?" মাঝি বলিল "একবার কাউকে আস্‌তে বলুন; একটী বাবু দাঁড়িয়ে আছেন।"

এই কথা শুনিয়া একটী লোক একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়াই দেখিল, তারক দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। সে তখন তাড়াতাড়ি হাতের লণ্ঠন নামাইয়া রাখিয়া তারকের পদধূলি লইল। তারক বলিলেন "মথুর, দাদা কেমন আছেন?"

মথুর বলিল "বড়বাবুর শরীর বড় খারাপ মেজবাবু! তিনি আর উঠ্‌তে পারেন না। আজও সন্ধ্যার সময় আপনার নাম করছিলেন, বল্‌ছিলেন আপনি বুঝি এলেন না।"

তারক আর শুনিতে পারিলেন না; তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে যাইয়া একেবারে উপরে চলিয়া গেলেন। সিঁড়িতে আলো ছিল না, ঘরের মধ্যে আবর্জ্জনা জমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তারকের যে এই বাড়ী;—এ বাড়ীর প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড যে তাঁহার পরিচিত—তাঁহার রক্তমাংসের সহিত মিশ্রিত।

তারক উপরে যাইয়া একেবারে কার্ত্তিকের শয়নকক্ষের দ্বারের নিকট গেলেন। দ্বার খোলাই ছিল। ঘরের মধ্যে মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল; তাহাতে ঘরের ভিতরের অন্ধকার যেন আরও গভীর হইয়াছিল। তারক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই পার্শ্ববর্ত্তী একখানি খাটের উপর হইতে শব্দ আসিল "কে? তারক এলি ভাই! তারক—।"

তারক এক দৌড়ে যাইয়া কার্ত্তিকের পায়ের উপর মাথা দিয়া পড়িলেন। তাঁহার তখন কথা বলিবার শক্তি অপহৃত হইয়াছিল। দাদার পায়ের উপর পড়িয়া তারক নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকও কিছু বলিতে পারিলেন না।

এই ভাবে প্রায় তিনচারি মিনিট চলিয়া গেল। তখন

কার্ত্তিক অতি কষ্টে, ক্ষীণস্বরে বলিলেন "তারক, ভাই ত আমার কাছে আয়। আমি যে আজ দুই বছর ভাই ব'লে কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারি নি। তাইতেই—তাইতেই ত আমার বুক শুকিয়ে গেছে ভাই!"

বড়বধূ নীচে রান্নাঘরে ছিলেন। তিনি যেই শুনিলেন যে, তারক আসিয়াছেন, অমনি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিলেন। ঘরের মধ্যে যাইয়াই দেখেন, তারক কার্ত্তিকের পা দুইখানি কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—দৌড়িয়া গিয়া তারককে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "ঠাকুরপো, আমাদের ক্ষমা কর ভাই!"

কার্ত্তিক এই কথা শুনিয়া মাথা একটু উঁচু করিয়া বলিলেন "তুমি কি বল্‌ছ বড়বৌ! আমি যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আমার ভাইকে আজ ফিরিয়ে পেয়েছি! আজ আর আমার মরণের ভয় নেই বড়বৌ! তারক, ভাই, তুমি আমার কোলের কাছে এসে বোসো। আমি তোমাকে আজ দুই বছর দেখি নেই ভাই! একবার আমাকে দাদা ব'লে ডাক,—একবার বল, আমার সকল অপরাধ তুমি ভুলে গিয়েছ। আমি তোমার কোলে মাথা রেখে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।"

তারক কার্ত্তিকের কোলের কাছে আসিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু "দাদা" বলিয়াই আর তিনি কিছু

বলিতে পারিলেন না, বালকের মত হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কাৰ্ত্তিক বলিলেন "কেঁদ না ভাই! কিসের কান্না! আমি যে আজ **বড়বাড়ীর** বিনিময়ে অমূল্য রত্ন লাভ কর্লাম ভাই!"

সেই সময় রাস্তা দিয়া কে গান করিয়া যাইতেছিল—

"এমন ঘরের হ'য়ে পরের মত
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।"

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা।

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত, অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালা-দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি কি এইরূপ সুলভে দেওয়া যায় না? অধুনা দেখিয়া-শুনিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে—যায়, যদি কাটতি অধিক হয় এবং মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ ছাপা বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। কারণ এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বাঙ্গালাদেশে পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; এ অবস্থায় 'আট-আনার গ্রন্থমালা" কেন চলিবে না?—সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা এই অভিনব চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লীসমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালা দেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ উদ্যম প্রথম। আমরা অনুরোধ করিতেছি, বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজে'র স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহ-বর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিলেই আমরা যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে আমাদিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। এই সিরিজের—প্রকাশিত হইয়াছে—

১। **অভাগী** (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
২। **ধর্ম্মপাল**—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।
৩। **পল্লী-সমাজ** (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। **কাঞ্চনমালা**—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই
৫। **বিবাহবিপ্লব**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল।
৬। **চিত্রালি**—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্।
৭। **দূর্ব্বাদল**—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
৮। **শাশ্বত ভিখারী**—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ পি, আর, এস।
৯। **বড়বাড়ী**—শ্রীজলধর সেন।
১০। **অরক্ষণীয়া** (যন্ত্রস্থ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।